রচনা-প্রণালী।

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ কোঙার।
সর্ব্বমঙ্গলা লাইব্রেরী,
১৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট্ (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

৬৬নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীবিনোদবিহারী পাল দ্বারা মুদ্রিত।
১৯২২।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র

ভূমিকা।

সুকুমারমতি বালকদিগকে রচনা শিক্ষা দেওয়া অতীব দুরূহ বিষয়। যাহাদিগের পর্য্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশ বা চিন্তাশক্তির উন্মেষ হয় নাই, তাহারা কোন একটী বিষয়ের ভাব সমূহ সংগ্রহ করিয়া সরল ভাষায় সে সমুদয় অভিব্যক্ত করিবে, এরূপ আশা করা যায় না। বালকগণের রচনা শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষক মহাশয়দিগের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমতঃ তাহাদিগকে পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য সমূহ রচনা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে; সে বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিলে, শেষে তাহাদিগকে প্রবন্ধ রচনা শিক্ষা দেওয়া উচিত। যে সকল বিষয় সম্বন্ধে সুকুমারমতি বালকদিগের কিঞ্চিৎপরিমাণ জ্ঞান আছে, অথবা যে সকল বস্তু তাহারা প্রতিনিয়ত দর্শন করিতেছে, সেই সকল বিষয় অবম্বন করিয়া তাহাদিগকে প্রবন্ধ রচনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে। এবিষয়ে কয়েকটী আদর্শপাঠও পুস্তকের প্রথমভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আশা করি, শিক্ষক মহাশয়গণ সেই সকল আদর্শপাঠের অনুকরণে ছাত্রদিগকে প্রবন্ধরচনা শিক্ষা দিতে প্রয়াস পাইবেন। পুস্তকে যে সকল প্রবন্ধ রচনা করিয়া দিয়াছি, তাহাদের ভাষা সরল ও বালকবৃন্দের বোধগম্য করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছি। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে বালকগণের কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিলে, আমার সমুদয় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা
জানুয়ারী, ১৯২২। } গ্রন্থকার।

সূচিপত্র।

রচনা-প্রণালী।

প্রথম অধ্যায়।

শব্দপ্রকরণ।

১। অর্থবোধক বর্ণ বা বর্ণসমূহকে শব্দ কহে। বিভক্ত্যন্ত শব্দকে পদ বলে। পদ পাঁচ প্রকার। যথা,—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

২। কোন পদার্থের নাম বলিতে হইলে, যে শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় তাহাকে বিশেষ্য বলে। যথা,—ফল, পুষ্প, জল ইত্যাদি।

৩। যে শব্দ দ্বারা বিশেষ্যের গুণ বা অবস্থার প্রকাশ হয়, তাহাকে বিশেষণ কহে। যথা—লাল ফুল, ছোট পাতা, ধনী লোক।

৪। যে সকল পদ, অন্য কোনও পদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, তাহা-দিগকে সর্ব্বনাম বলে। যথা,—অস্মদ্, যুষ্মদ্, যদ্, তদ্, এতদ্, ইদম্, অদস্, কিম্, অন্য, ইতর, সর্ব্ব, উভ, উভয়, ভবৎ, আপন, সকল ইত্যাদি।

৫। যে সকল শব্দ, সকল লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তিতে একরূপ তাহাদের নাম অব্যয়।

(ক) এবং, ও, আর, সুতরাং, অতএব প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়।

(খ) বা, অথবা, কিংবা, তথাপি, নতুবা, প্রভৃতি বিয়োজক অব্যয়।

(গ) কিন্তু, বরং প্রভৃতি সঙ্কোচক অব্যয়।

(ঘ) আহা, মরি মরি প্রভৃতি বিস্ময়সূচক অব্যয়।

(ঙ) যেন, বুঝি, যেমন, তেমন ইত্যাদি উপমাবাচক অব্যয়।

(চ) ওহে, হে, রে, অয়ি, ভোঃ প্রভৃতি সম্বোধনসূচক অব্যয়।

(ছ) থেকে, চেয়ে, দ্বারা, দিয়া প্রভৃতি বিভক্তিসূচক অব্যয়।

৬। ভূ, কৃ, স্থা, গম্ প্রভৃতিকে ধাতু বলে। ধাতুর উত্তর ইলে, ইয়া, ইতে প্রত্যয় এবং ইতেছে, ইতেছ, ইতেছি প্রভৃতি বিভক্তি যোগ করিলে যে পদ হয় তাহাকে ক্রিয়াপদ কহে।

৭। ক্রিয়া দুই প্রকার। যথা,—সমাপিকা ও অসমাপিকা।

(ক) যে ক্রিয়ার প্রয়োগে একটী বাক্যের শেষ হয় তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যথা,—রাম দৌড়িতেছে।

(খ) যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্যের শেষ হয় না, বক্তা তাহার পরে আরও কিছু বলিবে, এইরূপ বুঝায়, তাহা হইলে, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যথা,—আমি করিলে, তুমি করিবে ইত্যাদি।

৮। প্রত্যেক ক্রিয়া আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা,—সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক।

(ক) যে ক্রিয়ার কর্ম্মপদ আছে, তাহাকে সকর্ম্মক ক্রিয়া বলে। যথা,—রাম পুস্তক পড়ে। এখানে 'পুস্তক' কর্ম্ম।

(খ) যে ক্রিয়ার দুইটী কর্ম্মপদ থাকে, তাহাকে দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া বলে। যথা,—সে হরিকে পুস্তক পড়ায়। এখানে 'হরি,' ও 'পুস্তক' পড়ায় এই ক্রিয়ার কর্ম্ম।

(গ) যে ক্রিয়ার কর্ম্ম নাই, তাহাকে অকর্ম্মক ক্রিয়া বলে। যথা,—রাম কাঁদিতেছে। সে যাইতেছে।

৯। বিভক্তি দুই প্রকার। যথা,—শব্দবিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি

শব্দবিভক্তি সাত প্রকার। যথা,—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

১০। প্রত্যেক বিভক্তির দুইটী করিয়া বচন থাকে। যথা,—একবচন ও বহুবচন। একটী মাত্র সংখ্যা বুঝাইলে একবচন ও একের অধিক সংখ্যা বুঝাইলে বহুবচন হয়।

শব্দবিভক্তির রূপ।

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা—	অ, এ, তে, য়।	রা ইত্যাদি।
দ্বিতীয়া—	কে, রে, এ, য়।	দিগকে, দিগেরে, দেরে ইত্যাদি।
তৃতীয়া—	দ্বারা, দিয়া, কর্ত্তৃক, তে, এ, য়,	দিগের দ্বারা, দের দ্বারা, দেরে দিয়া ইত্যাদি।
চতুর্থী—	(দ্বিতীয়া বিভক্তির ন্যায়)	
পঞ্চমী—	হইতে, থেকে, চেয়ে।	দের থেকে, দের চেয়ে, দিগের চেয়ে ইত্যাদি।
ষষ্ঠী—	র।	দিগের, দের ইত্যাদি।
সপ্তমী—	তে, এ, য়।	

সপ্তমীর বহুবচনে বিভক্তির কোন আকার নাই। গণ, গুলি, সকল প্রভৃতির উত্তরে সপ্তমীর একবচনের বিভক্তি যোগ করিলে, সপ্তমীর বহুবচনের বিভক্তির কার্য্য করিবে।

বালক শব্দ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	বালক	বালকেরা।
দ্বিতীয়া	বালককে	বালকদিগকে।
তৃতীয়া	বালক দ্বারা	বালকদিগের দ্বারা।
চতুর্থী	বালককে	বালকদিগকে।
পঞ্চমী	বালক হইতে	বালকদিগের হইতে।
ষষ্ঠী	বালকের	বালকদিগের।
সপ্তমী	বালকে	বালকগণে বা বালক সকলে।

সর্ব্বনাম শব্দ।

১। অস্মদ্ শব্দের রূপ।

বিভক্তি।	একবচন।	বহুবচন।
প্রথমা	আমি, মুই।	আমরা, মোরা।
দ্বিতীয়া	আমাকে, মোরে, মোকে।	আমাদিগকে, মোদের, মোদিগকে, মোদিগেরে।
তৃতীয়া	আমাদ্বারা, মো দ্বারা।	আমাদের দ্বারা, মোদের দ্বারা।
চতুর্থী	(দ্বিতীয়া বিভক্তির ন্যায়)	
পঞ্চমী	আমা হইতে, আমাচেয়ে।	আমাদের চেয়ে, মোদের চেয়ে।
ষষ্ঠী	আমার, মোর, মম।	আমাদিগের, আমাদের, মোদের।

সপ্তমী	আমাতে, আমায়, মোতে্।	আমাদিগেতে, মোদিগেতে।

২। যুষ্মদ্ শব্দ।

বিভক্তি।	একবচন।	বহুবচন।
প্রথমা	তুমি, তুই।	তোমরা তোরা।
দ্বিতীয়া	তোমাকে, তোকে।	তোমাদিগকে, তোদেরে।
তৃতীয়া	তোমা দ্বারা, তো দ্বারা,	তোমাদের দ্বারা, তোদের দ্বারা।
	তোকে দিয়া তোরে দিয়া।	তোদেরে দিয়া।
চতুর্থী	(দ্বিতীয়া বিভক্তির ন্যায়)	
পঞ্চমী	তোমা হইতে, তোমাথেকে, তোমা চেয়ে, তোর চেয়ে, তো থেকে।	তোমাদের চেয়ে, তোদের চেয়ে, তোদের থেকে।
ষষ্ঠী	তোমার, তোর,	তোমাদের, তোদের।
সপ্তমী	তোমাতে, তোমায়, তোয়, তোতে।	তোমাদিগেতে, তোদিগেতে।

৩। 'আপন' এই সর্ব্বনাম পদটী সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত হয়। যথা,—আপনি, আপনারা, আপনাকে, আপনাদিগকে ইত্যাদি আমি বা তুমি পদের ন্যায়—অবশিষ্ট রূপ হইবে।

৪। 'যদ্' ও 'তদ্' এই দুইটি সর্ব্বনাম শব্দ অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্ত্তে বসে। উহারা প্রায়ই এক বাক্যে থাকে। যথা,—যে আলস্য করে, সে চিরকাল দুঃখ পায়।

(ক) যদ্ শব্দ সম্ভ্রমার্থে যিনি এবং অন্যত্র যে হয়। যথা,—যিনি

যাঁহারা, যাঁহাকে, যাঁহাদিগকে ইত্যাদি। অন্যত্র—যে, যাহারা, যাহাকে, যাহাদিগকে ইত্যাদি। অবশিষ্ট রূপ আমি বা তুমি পদের ন্যায়।

(খ) তদ্ শব্দ সম্ভ্রমার্থে তিনি, অন্যত্র, সে হয়। যথা,—তিনি, তাঁহারা এবং সে, তাহারা ইত্যাদি আমি বা তুমি পদের ন্যায়।

৫। 'এতদ্' ও 'ইদম্' এই দুইটী সর্ব্বনাম শব্দ নিকটবর্ত্তী বা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্ত্তে বসে। এই দুইটী সম্ভ্রমার্থে বাঙ্গালায় 'ইনি' এবং অন্যত্র 'এ' কিংবা ইহা হয়। যথা,—ইনি, ইঁহারা ; এ, ইহারা এবং ইহা, এ গুলি ইত্যাদি। অবশিষ্ট রূপ আমি বা তুমি পদের ন্যায়।

৬। অদস্ এই সর্ব্বনাম পদের পরিবর্ত্তে সম্ভ্রমার্থে বাঙ্গলায় 'উনি' এবং অন্যত্র 'ও' এবং উহা, ওগুলি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট রূপ আমি বা তুমি পদের ন্যায়।

৭। কিম্ এই সর্ব্বনাম শব্দটী প্রশ্নবোধক। সম্ভ্রমার্থে বাঙ্গালায় কে, কাঁহারা, কাঁহাদিগকে, কাঁহার দ্বারা, কাঁদের দ্বারা ইত্যাদি অন্যত্র কে, কাহাকে, কাহার দ্বারা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট রূপ আমি ও তুমি পদের ন্যায়।

৮। 'সকল' এই সর্ব্বনাম পদটী বহুবচনান্ত। যথা,—সকলে, সকলকে, সকলের দ্বারা ইত্যাদি। অবশিষ্ট রূপ—আমি বা তুমি পদের ন্যায়।

ক্রিয়া বিভক্তির রূপ।

(সমাপিকা ক্রিয়া)

(ক) বর্ত্তমান কাল।

উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
ইতেছি।	ইতেছ।	ইতেছে।
ই।	অ।	এ
ই।	অ।	উন বা উক।

(খ) ভবিষ্যৎ কাল।

ইব।	ইবে।	ইবে।

(গ) অতীত কাল।

ইলাম।	ইলে।	ইল।
ইয়াছি।	ইয়াছ।	ইয়াছে।
ইতাম।	ইতে।	ইত।
ইয়াছিলাম।	ইয়াছিলে।	ইয়াছিল।
ইতেছিলাম।	ইতেছিলে।	ইতেছিল।

প্রথম পুরুষ পূজ্য হইলে ক্রিয়ার শেষ 'ন' যোগ করিতে হয়। যথা—আপনি করিতেছেন, করিয়াছেন বা করিলেন।

(অসমাপিকা ক্রিয়া)

অতীত কাল।

ইলে।	ইলে।	ইলে।
ইতাম।	ইতে।	ইত।

অস্ ('হওয়া') ধাতু।

(ক) বর্ত্তমান কাল।

উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ।	প্রথম পুরুষ।
হইতেছি।	হইতেছ।	হইতেছে।
হই।	হও।	হয়, হন।
হই।	হও।	হউক, হউন।

(খ) ভবিষ্যৎ কাল।

হইবে।	হইবে।	হইবে, হইবেন।

(গ) অতীত কাল।

হইতেছিলাম	হইতেছিলে	হইতেছিল।
হইয়াছি	হইয়াছ	হইতেছিলেন।
হইয়াছিলাম	হইয়াছিলে	হইয়াছে, হইয়াছেন, হইয়াছিল, হইয়াছিলেন।
হইলাম	হইলে	হইল, হইলেন।
হইতাম	হইতে	হইত হইতেন

(অসমাপিকা ক্রিয়া।)

হইলে	হইলে	হইলে
হইতাম	হইতে	হইত বা হইতেন।

কৃ (করা) ধাতু।

(ক) বর্ত্তমান কাল।

উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ।
করিতেছি	করিতেছ	করিতেছে, করিতেছেন।
করি	কর	করে, করেন।
করি	কর	করুক, করুন।

(খ) ভবিষ্যৎ কাল।

করিব	করিবে	করিবে, করিবেন।

(গ) অতীত কাল।

করিয়াছি,	করিয়াছ	করিয়াছিল।
করিয়াছিলাম	করিয়াছিলে	করিয়াছিলেন।
করিতেছিলাম	করিতেছিলে	করিয়াছে, করিয়াছেন, করিতেছিল, করিতেছিলেন।
করিলাম	করিলে	করিল, করিলেন।
করিতাম	করিতে	করিতে করিতেন।

(অসমাপিকা ক্রিয়া)

করিলে	করিলে	করিলে।
করিতাম	করিতে	করিত বা করিতেন

সম্বোধন বিধি।

১। অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ সম্বোধনে যেমন তেমনি থকে। যথা—হে গোপাল!

২। হ্রস্বইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ একারান্ত হয়। যথা,—হে মুনে!

৩। হ্রস্বউকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ ওকারান্ত হয়। যথা,—হে গুরো!

৪। ঋকারান্ত শব্দ বিসর্গান্ত হয়। যথা,—হা মাতঃ, হা পিতঃ!

৫। বৎ ও মৎ ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ বন্ ও মন্ ভাগান্ত হয়। যথা,—হে ভগবন্! হে বুদ্ধিমন্!

৬। অন্ ও ইন্ ভাগান্ত শব্দ যেমন তেমনি থাকে। যথা,—হে রাজন্! হে গুণিন্

৭। আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ একারান্ত হয়। যথা,—হে দুর্গে!

৮। হ্রস্বইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ একারান্ত হয় যথা,—হে মতে!

৯। দীর্ঘঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হ্রস্বইকারান্ত হয়। যথা'—হে নদি!

১০। দীর্ঘঊকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হ্রস্বউকারান্ত হয়। যথা,—হে বধু!

স্ত্রীপ্রত্যয়।

১। অকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত হয়। যথা,—বৃদ্ধ, বৃদ্ধা; দরিদ্র, দরিদ্রা; কুমার, কুমারী; নদ, নদী।

২। অক ভাগান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ইকা ভাগান্ত হয়। যথা,—বালক, বালিকা; পাচক, পাচিকা; গায়ক, গায়িকা।

৩। জাতিবাচক অকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ঈকারান্ত হয়। যথা,—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী; সিংহ, সিংহী; ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রী।

৪। কতকগুলি জাতিবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ঈকারান্ত না হইয়া আকারান্ত হয় যথা,—কোকিল, কোকিলা; অজ, অজা; অশ্ব, অশ্বা; মূষিক, মূষিকা।

৫। ময়, দৃশ, চর ও কর ভাগান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ঈকারান্ত হয়। যথা,—করুণাময়, করুণাময়ী; তাদৃশ, তাদৃশী; জলচর, জলচরী; সুখকর, সুখকরী।

৬। ইন্দ্র, বরুণ, ব্রহ্মা, রুদ্র, ভব ও সর্ব্ব শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে আনী প্রত্যয়ান্ত হয়। যথা—ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী; বরুণ, বরুণানী; ব্রহ্মন্, ব্রহ্মাণী; রুদ্র, রুদ্রাণী; ভব, ভবানী; সর্ব্ব, সর্ব্বাণী।

৭। অঙ্গবাচক অকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত বা ঈকারান্ত হয়, যথা,—সুকেশ, সুকেশী, সুকেশা; সুমুখ, সুমুখী, সুমুখা।

৮। হ্রস্বউকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে দীর্ঘউকারান্ত হয়। যথা,—তনু বা তনূ; সরযু বা সরযূ।

৯। কতকগুলি হ্রস্বউকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হয়। যথা,—সাধু সাধ্বী; গুরু, গুর্ব্বী।

১০। অৎ, বৎ, মৎ ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা,—মহৎ, মহতী; গুণবৎ, গুণবতী; শ্রীমৎ, শ্রীমতী।

১১। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত এবং তদ্ভিন্ন শব্দ ঈকারন্ত হয়। যথা,—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী ইত্যাদি।

১২। মাতুল, আচার্য্য, ক্ষত্রিয়, প্রভৃতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন

রূপ হয়। যথা,—মাতুল, মাতুলানী, মাতুলা; আচার্য্য, আচার্য্যানী, আচার্য্যা; ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়াণী, ক্ষত্রিয়া।

১৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গের কোন নিয়ম নাই। যথা,—

পতি	পত্নী।	নর	নারী
শ্বশুর	শ্বশ্রূ।	বিদ্বান্	বিদুষী।
যুবক	যুবতী।	মনুষ্য	মনুষী।
মৎস্য	মৎসী।	সূর্য্য	সূরী বা সূর্য্যাণী।
শ্বন্	শুনী।	প্রাচ্	প্রাচী।
ভাই	ভগিনী।	পুরুষ	স্ত্রী।
পিতা	মাতা।	অরণ্য	অরণ্যানী।

কারক।

১। ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় থাকে তাহাকে কারক বলে। কারক ছয় প্রকার। যথা,—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ।

২। যে করে তাহাকে কর্ত্তা কহে। যথা,—বালক পড়িতেছে। কর্ত্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়।

৩। যাহা করা যায় তাহাকে কর্ম্ম কহে। যথা,—গুরু শিষ্যকে পড়াইতেছেন। কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

৪। কর্ত্তা যাহা দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকে করণ কারক কহে। যথা, তিনি অস্ত্র দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিতেছেন। করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

৫। দানের পাত্রকে সম্প্রদান বলে। সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা,—দরিদ্রকে ধন দাও। 'রজককে বস্ত্র দাও' এখানে 'রজক' সম্প্রদান কারক নহে। কারণ রজককে বস্ত্র দান করা হইতেছে না।

৬। যাহা হইতে কোন বস্তু চলিত, ভীত, গৃহীত, উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়, তাহাকে অপাদান বলে। অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা,— বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে, পর্ব্বত হইতে নদী উৎপন্ন হইয়াছে।

৭। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কহে। অধীকরণে ৭মী বিভক্তি হয়। অধিকরণ তিন প্রকার। যথা,—কালাধিকরণ আধারাধিকরণ, বিষয়াধিকরণ। বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়। (কালাধিকরণ) বনে ব্যাঘ্র বাস করে। (আধারাধিকরণ) তিনি অঙ্কে পণ্ডিত। (বিষয়াধিকরণ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাক্য প্রকরণ।

১। যে কয়টি কথার দ্বারা মনের একটী সম্পূর্ণ ভাব বলা যায় তাহাকে বাক্য বলে। যথা,—শিশু হাসিতেছে।

২। যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিছু বলা যায় তাহাকে উদ্দেশ্য কহে। কর্ত্তা ও তাহার বিশেষণ উদ্দেশ্য।

৩। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা যায় তাহাকে বিধেয় কহে। ক্রিয়া, ক্রিয়ার বিশেষণ ও কারকাদি পদ বিধেয়। একটী সুন্দর বালক দ্রুতপদে পাঠশালায় আসিতেছে। এই বাক্যে কর্ত্তা ও তাহার বিশেষণ 'একটী সুন্দর বালক' উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ কারকাদি পদ 'দ্রুতপদে পাঠশালায় আসিতেছে' বিধেয়।

৪। যে বাক্যে একটী উদ্দেশ্য ও একটী বিধেয় থাকে তাহাকে সরল বাক্য কহে।

[শিক্ষক মহাশয়গণ, প্রথম শিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল বাক্য রচনা করাইতে শিখাইবেন। মিশ্র কিংবা যৌগিক বাক্য সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিবেন না।]

বাক্যে পদস্থাপন প্রণালী।

১। সম্বোধন পদ—যাহাকে সম্বোধন করা যায়, তাহার পূর্ব্বে বসে। যথা,—হে বালকগণ, তোমরা সারাদিন খেলা করিও না।

২। বিশেষণ পদ—যে বিশেষ্যপদের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে, তাহার পূর্ব্বে বসে। যথা,—ভাল জল, লাল ফুল, সুশীল বালক।

৩। কর্ত্তৃকারক—ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে বসে। যথা,—শিশু খেলিতেছে।

৪। কর্ম্মকারক—কর্ত্তার পরে ও ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে বসে। যথা,—আমি ভাত খাইতেছি।

৫। করণকারক—কর্ম্মকারকের পূর্ব্বে বসে। যথা,—তিনি ছুরি দিয়া কলম কাটিতেছেন।

৬। সম্প্রদান কারক—কর্ম্মকারকের পূর্ব্বে বসে। যথা,—দরিদ্রকে ধন দাও।

৭। অপাদান কারক—কোন কোন স্থলে কর্ত্তার পূর্ব্বে বসে। কখন কখন বা কর্ত্তার পরে বসে। যথা,—বৃক্ষ হইতে ফল পড়ে। সে নদী হইতে জল আনিতেছে।

৮। অধিকরণ কারক—যাহার আধার তাহার পূর্ব্বে বসে। যথা,—আমি প্রাতঃকালে লেখাপড়া করি। আমরা গৃহে থাকি। বনে বাঘ আছে।

৯ সম্বন্ধ পদ—যাহার সহিত সম্বন্ধ, তাহার পূর্ব্বে বসে। যথা,—আমার কলম দাও। তোমার পুস্তক লও।

১০। অসমাপিকা ক্রিয়া—সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা—সে আমার নিকট আসিয়া পরে তোমার নিকট যাইবে।

১১। ক্রিয়ার বিশেষণ—যে ক্রিয়ার গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে তাহার পূর্ব্বে বসে। যথা,—ধীরে চল। শীঘ্র পড়।

১২। যে সকল বিশেষণ পদ অন্য বিশেষণ পদের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে বলিয়া বোধ হয়, তাহারাও প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়ার বিশেষণ। এবং যে বিশেষণকে বিশেষ করে, তাহার পূর্ব্বে বসে। যথা,—সে অতিশয় মন্দ এখানে 'অতিশয়' এই বিশেষণ পদটী 'মন্দ' এই বিশেষণপদটীকে যেন বিশেষ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ—অতিশয় যেরূপে হয় সেইরূপ—সুতরাং 'হয়' এই উহ্য ক্রিয়ার বিশেষণ।

১৩। সমাপিকা ক্রিয়া সকলের শেষে বসে। যথা, হে রাম, তোমার ভাইকে সঙ্গে করিয়া সেখানে গেলেও কাহাকে দেখিতে পাইবে না।

প্রথম উদাহরণ মালা।

১। নিম্নলিখিত বিশেষ্যপদ গুলির প্রত্যেকটীকে কর্ত্তৃকারক রূপে ব্যবহার করিয়া দশটী সরল বাক্য রচনা কর। (ক) বৃক্ষ (খ) লতা (গ) মনুষ্য (ঘ) পশু (ঙ) পক্ষী (চ) গরু (ছ) মেষ (জ) বৃষ (ঝ) হস্তী (ঞ) অশ্ব (ট) বিড়াল (ঠ) কুকুর (ড) ছাগ (ঢ) ভল্লুক (ণ) গণ্ডার (ত) কীট (থ) পতঙ্গ (দ) জল (ধ) অগ্নি (ন) বায়ু (প) চন্দ্র (ফ) সূর্য্য (ব) নক্ষত্র (ভ) আকাশ (ম) পৃথিবী (য) নদী (র) পর্ব্বত (ল) সাগর (ব) ফুল (শ) ফল (ষ) পত্র (স) হরিণ (হ) বীজ (অ) স্বর্গ (আ) ধান্য (ই) স্বর্ণ (ঈ) আম্র (উ) লৌহ।

দ্বিতীয় উদাহরণ মালা।

২। নিম্নলিখিত বিশেষ্যপদ গুলির প্রত্যেকটীকে কর্ম্মকারক রূপে ব্যবহার করিয়া পাঁচটী সরল বাক্য রচনা কর।

(ক) কলম (খ) পুস্তক (গ) কাগজ (ঘ) কাপড় (ঙ) পাথর (চ) ধন (ছ) বেতন (জ) পোষাক (ঝ) জল (ঞ) বৃক্ষ (ট) পত্র (ঠ) সূর্য্য (ড) চন্দ্র (ঢ) কিরণ (ণ) অশ্ব (ত) হস্তী (থ) ছাগ (দ) মহিষ (ধ) বিড়াল (ন) মেষ (প) ভল্লুক (ফ) গণ্ডার (ব) তারা (ভ) ফল (ম) ফুল (য) হরিণ (র) বীজ (ল) পর্ব্বত (ব) ছুরি (শ) কলসী (ষ) নল (স) রজক।

তৃতীয় উদাহরণ মালা।

৩। নিম্নলিলিখিত বিশেষ্যপদ গুলির প্রত্যেকটীকে করণকারকরূপে ব্যবহার করিয়া পাঁচটী সরল বাক্য রচনা কর।

(ক) হস্ত (খ) পদ (গ) কর্ণ (ঘ) চক্ষু (ঙ) ত্বক্ (চ) জিহ্বা (ছ) নাসিকা (জ) মন (ঝ) বুদ্ধি (ঞ) জ্ঞান (ট) পরিশ্রম (ঠ) নিদ্রা (ড) আহার (ঢ) ভ্রমণ (ণ) আলস্য (ত) পাপ (থ) পুণ্য (দ) কলম (ধ) অস্ত্র (ন) ছুরি (প) কাঁচি (ফ) কুঠার (ব) অগ্নি (ভ) বায়ু (ম) জল (য) স্বর্ণ (র) লৌহ (ল) রৌপ্য (ব) তাম্র (শ) তণ্ডুল (ষ) গম (স) কলাই (হ) পাট।

চতুর্থ উদাহরণ মালা।

৪। নিম্নলিখিত বিশেষ্যপদ গুলির প্রত্যেকটীকে অপাদান কারক-রূপে ব্যবহার করিয়া পাঁচটী সরল বাক্য রচনা কর।

(ক) বৃক্ষ (খ) জল (গ) চন্দ্র (ঘ) সূর্য্য (ঙ) ব্যাঘ্র (চ) সিংহ (ছ) ফুল (জ) ফল (ঝ) দুগ্ধ (ঞ) নদী (ট) পর্ব্বত (ঠ) মৃত্তিকা (ড) গরু (ঢ) অগ্নি (ণ) বায়ু (ত) শস্য (থ) ধান্য (দ) তণ্ডুল (ধ) গম (ন) কলাই (প) সর্ষপ (ফ) গ্রহ (ব) উপগ্রহ (ভ) সাগর (ম) স্বর্ণ (য) রৌপ্য (র) তাম্র (ল) লৌহ (ব) বীজ (শ) শত্রু (ষ) মিত্র (স) বন।

পঞ্চম উদাহরণ মালা।

৫। নিম্নলিখিত বিশেষ্যপদ গুলির প্রত্যেকটিকে অধিকরণকারক-রূপে ব্যবহার করিয়া পাঁচটী সরল বাক্য রচনা কর।

(ক) বন (খ) ফুল (গ) বৃক্ষ (ঘ) আকাশ (ঙ) চন্দ্র (চ) সূর্য্য (ছ) জল (জ) বায়ু (ঝ) মৃত্তিকা (ঞ) নদী (ট) পর্ব্বত (ঠ) সাগর (ড) পুস্তক (ঢ) ছুরি (ণ) কাঁচি (ত) কুঠার (থ) ফল (দ) ধান্য (ধ) অগ্নি (ন) রাত্রি (প) দিবা (ফ) গৃহ (ব) বিদ্যালয় (ভ) পথ (ম) গাড়ী (য) পুকুর (র) কলসী (ল) বাটী (ব) ঘটি (শ) পাত্র (ষ) পুস্তক।

ষষ্ঠ উদাহরণ মালা।

৬। নিম্নলিখিত সর্ব্বনাম শব্দগুলির প্রত্যেকের সম্বন্ধ পদের সহিত পাঁচটী করিয়া বিশেষ্যপদ যোগ করিয়া পাঁচটী সরল বাক্য রচনা কর।

(ক) অস্মদ্ (খ) যুস্মদ্ (গ) তদ্ (ঘ) যদ্ (ঙ) এতদ্ (চ) কিম্ (ছ) ইদম্ (জ) আপন (ঝ) অদস্ (ঞ) সর্ব্ব (ট) সকল (ঠ) উভয়।

সপ্তম উদাহরণ মালা।

৭। নিম্নলিখিত বিশেষণপদ গুলির প্রত্যেকটার সহিত এক একটি বিশেষ্যপদ বসাইয়া পাঁচটী করিয়া সরল বাক্য রচনা কর।

(১) লাল (২) কাল (৩) সবুজ (৪) শাদা, শ্বেত (৫) হরিদ্রা, পীত (৬) ধূসর (৭) লম্বা (৮) খর্ব্ব (৯) কৃশ (১০) সুন্দর (১১) কুৎসিৎ (১২) সুস্থ (১৩) নীরোগ (১৪) রুগ্ন (১৫) কচি (১৬) পাকা, পক্ক (১৭) দুষ্ট (১৮) নিরীহ (১৯) হিংস্র (২০) অন্ধ (২১) কালা, বধির (২২) বোবা (২৩) খোঁড়া, খঞ্জ (২৪) ভোঁতা (২৫) ধারাল, তীক্ষ্ণ (২৬) সতর্ক (২৭) অসাবধান (২৮) সভ্য (২৯) অসভ্য (৩০) বোকা (৩১) মূর্খ (৩২) ধার্ম্মিক (৩৩) পাপী (৩৪) যোগ্য (৩৫) অযোগ্য (৩৬) দক্ষ (৩৭) নিপুণ (৩৮) ন্যায় (৩৯) অন্যায় (৪০) কৃতজ্ঞ (৪১) অকৃতজ্ঞ (৪২) ধূর্ত্ত (৪৩) শান্ত (৪৪) দুরন্ত (৪৫) চঞ্চল (৪৬) গম্ভীর (৪৭) দয়ালু (৪৮) নিষ্ঠুর (৪৯) সাহসী (৫০) ভীরু (৫১) পোষা (৫২) অলস (৫৩) জ্ঞানী (৫৪) ধনী (৫৫) গরিব (৫৬) উপস্থিত (৫৭) অনুপস্থিত (৫৮) যুবা (৫৯) বৃদ্ধ (৬০) প্রফুল্ল (৬১) বিষন্ন (৬২) মহার্ঘ (৬৩) সস্তা (৬৪) জীবিত (৬৫) মৃত (৬৬) ক্ষুধার্ত্ত (৬৭) পিপাসার্ত্ত (৬৮) শুষ্ক (৬৯) ভিজা, আর্দ্র (৭০) গরম (৭১) ঠাণ্ডা, শীতল (৭২) তিক্ত (৭৩) উজ্জ্বল (৭৪) মিষ্ট (৭৫) অম্ল (৭৬) স্বাস্থ্যকর (৭৭) পুষ্টিকর (৭৮) পচা (৭৯) শক্ত (৮০) নরম, কোমল (৮১) সুস্বাদু (৮২) সিদ্ধ (৮৩) সামান্য (৮৪) বড় (৮৫) নূতন (৮৬) পুরাতন (৮৭) উচ্চ (৮৮) নিম্ন (৮৯) সোজা, সরল (৯০) বক্র, বাঁকা (৯১) খালি, ফাঁপা (৯২) পূর্ণ (৯৩) মহৎ (৯৪) ঘন (৯৫) পাতলা (৯৬) মোটা (৯৭) গোল (৯৮) পবিত্র (৯৯) নির্জ্জন (১০০) বিশুদ্ধ (১০১) সুখী (১০২) দুঃখী (১০৩) জ্ঞানী (১০৪) সাধু।

অষ্টম উদাহরণ মালা।

৮। নিম্নলিখিত পদ গুলির প্রত্যেকটীকে ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহার করিয়া পাঁচটী সরল বাক্য রচনা কর।

(ক) দুঃখে (খ) সুখে (গ) ধীরে (ঘ) অকাতরে (ঙ) মন্দ মন্দ (চ) মৃদু মৃদু (ছ) শীঘ্র (জ) দ্রুত (ঝ) সত্বর (ঞ) সুন্দর।

নবম উদাহরণ মালা।

৯। নিম্নলিখিত পদ গুলির প্রত্যেকটীকে বিশেষণ (ক্রিয়া বিশেষণ বোধক) রূপে ব্যবহার করিয়া পাঁচটী সরল বাক্য রচনা কর।

(ক) অতি (খ) খুব (গ) অত্যন্ত (ঘ) পরম (ঙ) নিতান্ত (চ) অতিশয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

রচনা লিখিবার প্রণালী।

শিক্ষক মহাশয়গণের প্রতি অনুরোধ।—শিক্ষক মহাশয়গণের যেন ধারণা থাকে, সে সুকুমারমতি বালকদিগকে প্রবন্ধ-রচনা শিক্ষা দেওয়া অতীব গুরুতর বিষয়। প্রথমতঃ প্রবন্ধের বিষয় নিরূপণ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। কারণ যে সকল বিষয়, বস্তু বা প্রাণী শিশুরা দেখে নাই বা শুনে নাই, কিংবা যাহাদের সম্বন্ধে শিশুদিগের কোন প্রকার ধারণা নাই, সে সকল বিষয়, প্রবন্ধ লিখিবার জন্য নিরূপণ করিলে তদ্দ্বারা তাহাদিগের কোন উপকারই হইবে না। তাহারা একটী বর্ণও রচনা করিতে পারিবে না। সুতরাং যে সকল বিষয়, বা যেসকল বস্তু কিংবা জীবজন্তু, শিশুরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পায়, বা যাহাদের সম্বন্ধে

তাহাদের কিয়ৎ পরিমাণে ধারণা আছে, এইরূপ বিষয় প্রথমতঃ প্রবন্ধ রচনার জন্য নিরূপিত করিতে হইবে। সময়ে সময়ে প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের ভার তাহাদিগের উপর দিতে হইবে। তাহা হইলে শিশুগণ প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ আনন্দ অনুভব করিবে। কিন্তু এইরূপ বিষয় নিরূপণ করিয়াই, শিক্ষক মহাশয়গণ, নিশ্চিন্ত থকিবেন না। কিরূপ করিয়া, একটী বিষয়কে বিশ্লেষ করিতে হইবে, কিরূপে তাহার শ্রেণী বিভাগ এবং কিরূপ করিয়া, একটীর পর আর একটীর সন্নিবেশ করিতে হইবে সে জ্ঞান শিশুদিগের থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। সুতরাং, শিক্ষক মহাশয়গণ, নির্ব্বাচিত বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে বিবিধ প্রশ্ন করিবেন। তাহারা যতগুলির উত্তর দিতে পারে, তাহা দেখিয়া, অবশিষ্ট গুলির উত্তর শিক্ষক মহাশয়গণ নিজেরাই বলিয়া দিবেন। এবং এই সকল প্রশ্ন, বিষয়টির বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভাগ অনুসারে করিবেন। বালকদিগকেও ইচ্ছামত প্রশ্ন করিতে আদেশ করিবেন। এইরূপ করিলে বালকগণের মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অভ্যাস বৃদ্ধি পাইবে, বিচার শক্তির উন্মেষ হইবে, মনের চালনা অর্থাৎ চিন্তা করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। এবং বালকেরা পরিশেষে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে শিখিবে। শিক্ষক মহাশয়গণ, প্রথমতঃ বালকগণকে ভাষার রীতি (style) শিক্ষা দিবার জন্য প্রয়াস পাইবেন না। তাহারা যাহাতে সরল ভাবে, সরল বাক্যে, মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিখে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

প্রথমতঃ যেমন শিক্ষক মহাশয়গণ নির্ব্বাচিত বিষয় সম্বন্ধে একএকটী প্রশ্ন করিবেন, ছাত্রগণ উত্তর দিতে পারিলে অমনি তাহাদিগকে পর্য্যায় ক্রমে খড়ি লইয়া বোর্ডে লিখিতে বলিবেন। একএকটী প্রশ্নের উত্তর এক, দুই বা ততোধিক সরল বাক্য দ্বারা প্রদত্ত হইবে। এইরূপে সমস্ত

প্রশ্নগুলির উত্তর বোর্ডে লেখা হইলে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা করা হইবে। তখন শিক্ষক মহাশয়েরা দেখিবেন যে, বালকগণ লিখিবার সময় বর্ণাশুদ্ধি কিংবা ব্যাকরণ ঘটিত কোন অশুদ্ধ পদ লিখিয়াছে কি না। তৎপরে তাঁহারা সেই সকল সংশোধন করিয়া দিবেন। এইরূপে প্রবন্ধ রচনা করিতে শিক্ষা দিলে, অল্পদিনের মধ্যে বালকগণের দক্ষতা জন্মিবে। নিম্নে কয়েকটী আদর্শ প্রদত্ত হইল।

বিড়াল।

শিক্ষক। তোমরা কতকগুলি গৃহপালিত জন্তুর নাম কর দেখি।

ছাত্র। মহাশয়, 'গৃহপালিতজন্তু' কথার অর্থ কি ?

শিক্ষক। যে সকল জন্তুকে মানুষে সচরাচর বাড়ীতে পুষিয়া থাকে।

ছাত্র। বিড়াল, কুকুর, ভেড়া, গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি।

শিক্ষক। আচ্ছা, আজ তোমরা বিড়ালের বিষয় রচনা কর।

ছাত্র। মহাশয়, তাহা হইলে লিখি 'বিড়াল গৃহপালিত জন্তু'।

শিক্ষক। বোর্ডে খড়ি দিয়া লিখ। পরে বল দেখি বিড়ালের কি কি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে ?

ছাত্র। বিড়ালের মস্তক, চক্ষু, কর্ণ, দন্ত, জিহ্বা, চারি পা ও লেজ আছে।

শিক্ষক। বোর্ডে লিখ। বল দেখি, বিড়ালের মস্তক কিরূপ ?

ছাত্র। বিড়ালের মস্তক ছোট ও গোল।

শিক্ষক। বোর্ডে লিখ। পরে বল বিড়ালের চক্ষু কিরূপ ?

ছাত্র। চক্ষুও গোল। অন্ধকারে ইহাদের চক্ষু যেন জ্বলিতে থাকে ইহারা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখিতে পায়।

শিক্ষক। বোর্ডে লিখ। ইহাদের কান কিরূপ ?

ছাত্র। ইহাদের কান ছোট ও সর্ব্বদা খাড়া থাকে।

শিক্ষক। বোর্ডে লিখ। পরে বল, ইহাদের দাঁত কিরূপ?

ছাত্র। ইহারা দাঁত দিয়া কোন বস্তু ছিঁড়িতে বা কাটিতে পারে না। ভালরূপে চিবাইতেও পারে না। ইহারা মাংস গিলিয়া খায়।

শিক্ষক। বেশ, বোর্ডে লিখ। পরে বল দেখি বিড়ালের জিহ্বা কিরূপ?

ছাত্র। বিড়ালের জিহ্বা শুষ্ক। তাহার উপরে ছোট কাঁটা আছে। ইহারা জিহ্বা দিয়া জল ও দুধ পান করে।

শিক্ষক। বেশ, বোর্ডে লিখ। বল দেখি বিড়ালের গোঁপ কিরূপ?

ছাত্র। বিড়ালের বড় বড় গোঁপ আছে। ইহারা গোঁপ সোজা ও খাড়া করিয়া চলে। কোন সরু পথ দিয়া যাইবার সময় যদি ইহাদের গোঁপ বাধা পায়, তাহা হইলে সে পথ ছাড়িয়া অন্য পথ দিয়া যায়।

শিক্ষক। বেশ, বোর্ডে লিখ। বল দেখি বিড়ালের গাত্র কি দিয়া ঢাকা?

ছাত্র। বিড়ালের মস্তক গাত্র লোমে ঢাকা। ইহাদের গায়ের লোম কোমল, মসৃণ ও চিক্কণ।

শিক্ষক। বেশ, বোর্ডে লিখ। বল দেখি বিড়ালের পা কিরূপ?

ছাত্র। ইহাদের পা ছোট, ইহাদের প্যয়ের তলায় মাংসের পুঁটুলি আছে। সুতরাং চলিবার সময় ইহাদের পায়ের শব্দ শুনা যায় না। উচ্চ স্থান হইতে পড়িলেও ইহারা পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়ায় বলিয়া ব্যাথা পায় না। ইহাদের অঙ্গুলিতে বক্র নখ আছে। ঐ নখ গুলি কোষ বা আবরণের মধ্যে গুটান থাকে। ইহারা এই সকল নখ দিয়া মাটি খোঁড়ে, এই সকল নখ গাছের ছালে বাধাইয়া, দৌড়িয়া উপরে উঠে, পড়িয়া যায় না। এই গুলি ইহাদের অস্ত্র। ইহারা কখনও মুখ বা

দাঁত দিয়া কাহাকেও কামড়াইতে যায় না। অন্য কোন জন্তু কামড়াইতে আসিলে, ইহারা নখ গুলি বাহির করিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে।

শিক্ষক। বেশ বোর্ডে লিখ। বল দেখি, ইহাদের লেজ কিরূপ?

ছাত্র। ইহারা এদিকে ওদিকে লেজ নাড়িতে পারে। চলিবার সময় কখন লেজ ঝুলিতে থাকে। কখন কখন বা খাড়া করিয়া চলে।

শিক্ষক। উত্তর গুলি বেশ হইয়াছে। বোর্ডে লিখ, তারপর বল দেখি বিড়ালের কোন শক্তি প্রবল? ইহারা কোন্ কোন্ বিষয় ভালবাসে? আর কোন্ কোন্ বিষয় ভালবাসে না?

ছাত্র। বিড়ালের শ্রবণশক্তি অতিশয় প্রবল। ইহারা জলে ভিজিতে ভালবাসে না। গায়ে জল বা ময়লা লাগিলে ইহারা জিহ্বা দিয়া চাটিয়া পরিষ্কার করে। ইহারা নরম বিছানায় শুইতে ভালবাসে। ইহাদের গায়ে হাত বুলাইলে বড় আরাম বোধ করে।

শিক্ষক। ইহারা কিরূপ করিয়া, শিকার করে তাহা তোমরা জান?

ছাত্র। হাঁ মহাশয়, ইহারা ইন্দুর ধরিতে খুব ভালবাসে। ইন্দুর গর্ত্ত খুঁড়িতেছে জানিতে পারিলে, তাহার নিকটে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ইন্দুর গর্ত্তের বাহিরে আসিলে পর, এক লাফে তাহার উপর গিয়া পড়ে। উহাকে দাঁত দিয়া ধরিয়া পুনরায় ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে তাহার সহিত কিছুক্ষণ খেলা করিয়া শেষে তাহাকে মারিয়া ফেলে ও তাহার মাংস খায়। সুযোগ পাইলে ইহারা পক্ষীশাবক, এমন কি বৃদ্ধ পক্ষী পর্য্যন্ত ধরিয়া মারিয়া ফেলে ও তাহাদের মাংস খায়।

শিক্ষক। উত্তর বেশ হইয়াছে। উত্তর গুলি বোর্ডে লিখ। তার

পর বল দেখি, বিড়ালী কিরূপে সন্তান প্রসব করে? ইহারা সন্তানদিগকে কিরূপ ভালবাসে?

ছাত্র। (উত্তর গুলি বোর্ডে লিখিয়া) মহাশয়, এ প্রশ্নের উত্তর আমি কিছুই জানি না।

শিক্ষক। আচ্ছা, আমি বলিয়া দিতেছি, মন দিয়া শুন। বিড়ালী ৬৩ দিন গর্ভধারণ করিয়া ৩টী হইতে ৬টী পর্য্যন্ত শাবক প্রসব করিয়া থাকে। প্রসবের সময় ইহাদের চক্ষু ফোটে না। প্রসবের ৯ দিন পরে ইহাদের চক্ষু ফোটে। বিড়ালী তাহার শিশু সন্তান গুলিকে খুব ভালবাসে। শৈশব কালে কেবল স্তন্যদুগ্ধ পান করাইয়া সন্তানগুলিকে লালনপালন করে, শেষে একটু বড় হইলে ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্দুর, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ধরিয়া আনিয়া শাবকদিগকে আহার করিতে দেয়। এই কথা গুলি বোর্ডে লিখ।

আকাশ।

শিক্ষক। আকাশ কোথায় আছে?

ছাত্র। আমরা যেখানেই যাই না কেন, সকল স্থানেই আকাশ আমাদের মাথার উপর আছে দেখিতে পাই।

শিক্ষক। আচ্ছা, এই কথা গুলি বোর্ডে লিখ। বল দেখি, আকাশের রং কিরূপ?

ছাত্র। আকাশের বর্ণ কখন নীল, কখন স্থানে স্থানে শাদা, কখন বা ধূসর।

শিক্ষক। আচ্ছা, ঐ কথা গুলি বোর্ডে লিখ। তার পর বল দেখি, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কেন ঐ রূপ ভিন্ন ভিন্ন রং হয়?

ছাত্র। আকাশে মেঘ না থাকিলে নীলবর্ণ দেখায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ থাকিলে, স্থানে স্থানে শাদা দেখায়। আর ঘন মেঘ থাকিলে ধূসরবর্ণ দেখায়।

শিক্ষক। বেশ, উত্তরগুলি বোর্ডে লিখ। বল দেখি, আকাশে মেঘ থাকাতে উপকার ক ?

ছাত্র। আকাশে মেঘ থাকিলে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি ও রৌদ্র না পাইলে, গাছ পালা জন্মে না ও বাঁচে না।

শিক্ষক। বেশ, উত্তর গুলি বোর্ডে লিখ। বল দেখি, আকাশে মেঘ ছাড়া আর কি কি দেখিতে পাওয়া যায় ?

ছাত্র। দিনের বেলায় আকাশে সূর্য্য দেখা যায়। আর রাত্রিকালে চন্দ্র ও ছোট বড় অনেক তারা দেখিতে পাওয়া যায়।

শিক্ষক। উত্তর গুলি বোর্ডে লিখ। বল দেখি, আকাশ দেখিতে কিরূপ ?

ছাত্র। আকাশ যেন দেখিতে ঠিক গোল গম্বুজের মত। চারিদিকে গোল হইয়া যেন ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

শিক্ষক। ঐ কথা বোর্ডে লিখ। তারপর বল দেখি, মাঠে গিয়া দেখিলে আকাশকে কিরূপ দেখায়।

ছাত্র। মাঠে গিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন আকাশ চারিদিকে গোল হইয়া ঝুলিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে।

শিক্ষক। আচ্ছা, বোর্ডে লিখ। বল দেখি উহাকে কি বলে ?

ছাত্র। উহাকে চক্রবাল বলে।

শিক্ষক। বোর্ডে এই কথা লিখ। বল দেখি, আকাশ কিরূপ পদার্থ ?

ছাত্র। মহাশয়, ইহার উত্তর আমি দিতে পারিলাম না। আপনি বলুন।

শিক্ষক। আমাদের চারিদিকেই বায়ু রহিয়াছে। কেবল যে আমাদের চারিধারেই বায়ু রহিয়াছে তাহা নহে। আমাদের মাথার উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত বায়ু রহিয়াছে। আমরা উপরের দিকে চাহিলে, এই বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া আকাশ দেখিতে পাই। সুতরাং আকাশ এই বায়ুমণ্ডল ছাড়া আর কিছুই নহে। এই কথা গুলি বোর্ডে লিখ।

জল।

শিক্ষক। জল কিরূপ পদার্থ?

ছাত্র। জল তরল পদার্থ।

শিক্ষক। বেশ, বোর্ডে লিখ। তারপর বল দেখি জলের আকার কিরূপ?

ছাত্র। জলের নিজের কোন আকার নাই। যখন যে পাত্রে রাখ, সেই পাত্রের আকার ধারণ করে।

শিক্ষক। বেশ, বোর্ডে লিখ। তার পর বল দেখি, জলের উপরিভাগ কিরূপ?

ছাত্র। ইহার উপরিভাগ সমতল।

শিক্ষক। বোর্ডে লিখ। পরে বল দেখি, জল উচ্চ দিক হইতে নিম্নদিকে গমনকালে কিরূপ আকার ধারণ করে।

ছাত্র। উচ্চদিক হইতে নিম্নদিকে গমন কালে জল ধারা বহিয়া গড়াইয়া যায়।

শিক্ষক। বোর্ডে লিখ। পরে বল, বিশুদ্ধ জল কিরূপ?

ছাত্র। বিশুদ্ধ জল বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধহীন এবং দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ।

শিক্ষক। বেশ, বোর্ডে লিখ। পরে বল, আমরা সময়ে সময়ে জলের গন্ধ ও আস্বাদ পাই কেন?

ছাত্র। জলের সহিত মাটি, চুণ, লবণ প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে বলিয়া আমরা সময়ে সময়ে উহার গন্ধ ও আস্বাদ পাইয়া থাকি।

শিক্ষক। বেশ, বোর্ডে লিখ। জলের দ্রাবকতা গুণ কাহাকে কহে?

ছাত্র। চিনি লবণ প্রভৃতি জলে দিলে উহারা দ্রব হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়।

শিক্ষক। বেশ, বোর্ডে লিখ। জল উত্তপ্ত করিলে কি হয়?

ছাত্র। জল উত্তপ্ত করিলে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। সেই বাষ্প হইতে মেঘ, কুয়াসা, শিশির, বৃষ্টি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

শিক্ষক। বেশ, বোর্ডে লিখ। বল দেখি, জল জমিয়া গেলে কি হয়?

ছাত্র। জল জমিয়া গেলে বরফ হয়।

শিক্ষক। বেশ, বোর্ডে লিখ। জলের কি ভার আছে?

ছাত্র। জলের ভার আছে। কারণ একটী খালি কলসী আনিতে কষ্ট হয় না; কিন্তু এক কলসী জল আনিতে কষ্ট বোধ হয়।

শিক্ষক। বেশ, বোর্ডে লিখ। জল দ্বারা কি কি উপকার হয়?

ছাত্র। শীতল জলে স্নান করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। শীতল জল পান করিলে পিপাসা দূর হয়। জল দ্বারা ধুইয়া আমরা সকল দ্রব্য পরিষ্কার করি। জল দ্বারা আমরা খাদ্য দ্রব্য রন্ধন করি। জল, জীব ও উদ্ভিদের প্রাণ রক্ষার একটী উপায়। এজন্য ইহার আর এক নাম জীবন। জল দ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়।

শিক্ষক। বেশ, উত্তর গুলি বোর্ডে লিখ। বল দেখি, কি কি পদার্থের যোগে জল উৎপন্ন হয়?

ছাত্র। উদজান ও অম্লজান এই দুই বায়ুর যোগে জল উৎপন্ন হয়।

আকবরের দয়া।

শিক্ষক। আকবর কে ছিলেন?

ছাত্র। আকবর দীল্লির মুসলমান সম্রাট ছিলেন।

শিক্ষক। বেশ বোর্ডে লিখ। বল দেখি, তিনি কেমন লোক ছিলেন?

ছাত্র। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন।

শিক্ষক। বেশ বোর্ডে লিখ। তাঁহার একটী দয়ার কার্য্যের বিষয় লিখ।

ছাত্র। যখন তাঁহার পনর বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। শত্রুরা সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার রাজ্য লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার পিতার বন্ধু বৈরাম খাঁ, তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিতেছিলেন। শেষে পাণিপথ নামক স্থানে বৈরাম খাঁর সহিত বিপক্ষ দলের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বৈরাম খাঁ বিপক্ষ দলের সেনাপতি হিমুকে বন্দী করেন। বৈরাম হিমুর অস্ত্র কাড়িয়া লইলেন, লৌহশৃঙ্খলে তাহাকে বদ্ধ করিয়া আকবরের নিকটে লইয়া গেলেন। এবং আকবরকে তরবারি দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন।

আকবর বলিলেন আমি কখনও এরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে পারিব না। এরূপ অসহায় বন্দীকে আমি মারিয়া ফেলিতে পারিব না। নিষ্ঠুরের মত এরূপ কাজ করিলে, আমার মহাপাপ হইবে। বৈরামের দয়া মায়া ছিল না, তিনি তৎক্ষণাৎ তরবারি দিয়া হিমুর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। আকবর দয়ার সাগর ছিলেন।

শিক্ষক। উত্তর বেশ হইয়াছে। বোর্ডে লিখ।

প্রবন্ধ-রচনা।

বুদ্ধ।

কাশী হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরে কপিলবস্তু নামে একটী রাজ্য ছিল। এক সময়ে, সেখানে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মে। সেই পুত্রের সিদ্ধার্থ নাম ছিল। শুদ্ধোদন পুত্রকে অত্যন্ত আদর করিতেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ পিতার অত্যন্ত আদরে অশান্ত হন নাই। বাল্যকাল হইতে তিনি নির্জ্জনে বসিয়া একাকী চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন। সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দে তাঁহার তত মন ছিল না। তিনি কাহারও দুঃখ কষ্ট দেখিলে কাঁদিয়া ফেলিতেন। কি করিলে তাহার দুঃখ দূর হয় তাহার চেষ্টা করিতেন। শুদ্ধোদন পুত্রের এইরূপ ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। সংসারের দিকে যাহাতে তাঁহার মন আসে, সেইজন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থের বিবাহ দিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না।

একদিন তিনি শকটে চড়িয়া নগরে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন, পথে দেখিতে পাইলেন, একবৃদ্ধ অতি কষ্টে লাঠি ভর দিয়া চলিতেছে। ইহার শরীর জীর্ণ ও শীর্ণ। বুদ্ধ এই বৃদ্ধকে দেখিয়া চালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তির ঐরূপ অবস্থা হইল কেন? চালক উত্তর করিল, কুমার! ঐ ব্যক্তি বৃদ্ধ। উহার শরীরে বল নাই, ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। বালক ও যুবক সকলেরই এক সময়ে এই বৃদ্ধের ন্যায় হইতে হইবে। এই কথা শুনিয়া বুদ্ধ চালককে গৃহে ফিরিবার কথা বলিলেন।

আর একদিন বুদ্ধ নগরভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন, পথে দেখিতে পাইলেন, একজন রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। কখন বৃক্ষের

তলায় শুইতেছে, কখন বা উঠিয়া বসিতেছে। বুদ্ধ চালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি ঐরূপ করিতেছে কেন? চালক উত্তর করিল, কুমার, ঐ ব্যক্তির পীড়া হইয়াছে। রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ঐরূপ করিতেছে। জীবনে কেহ রোগ ভোগ করেন নাই, এরূপ লোক সংসারে নাই। এই কথা শুনিয়া বুদ্ধ চালককে গৃহে ফিরিবার কথা বলিলেন।

তৃতীয় দিন বুদ্ধ নগরভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন। পথে দেখিতে পাইলেন কয়েকজন লোক একটী মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আর কতকগুলি লোক কাঁদিতে কাঁদিতে পশ্চাৎ যাইতেছে। বুদ্ধ চালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা ঐরূপ করিতেছে কেন? চালক উত্তর করিল, যাহাকে স্কন্ধে করিয়া যাইতেছে ঐ ব্যক্তি মৃত। যাহারা পশ্চাৎ যাইতেছে, উহারা ঐ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়। উহারা মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিতেছে। তখন বুদ্ধ চালককে গৃহে ফিরিবার কথা বলিলেন।

চতুর্থ দিবস বুদ্ধ নগরে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন; পথে দেখিতে পাইলেন, এক বৃক্ষতলে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া বুদ্ধের মনে খুব ভক্তি হইল। তিনি চালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? চালক উত্তর করিল, কুমার, ইনি সন্ন্যাসী। ইনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন্। ইঁনি তরুতলে শয়ন করেন, ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করেন। ইঁহার ন্যায় সুখী পৃথিবীতে কেহ নাই। এই কথা শুনিয়া বুদ্ধ চালককে গৃহে ফিরিবার কথা বলিলেন।

বুদ্ধ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। সংসারে থাকিতে হইলে জরা, রোগ ও মৃত্যুর হস্তে নিস্তার নাই দেখিয়া, সংসার তাঁহার ভাল লাগিল না। কিছুদিন পরে তিনি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আকবর।

ভারতবর্ষে রাজপুতনা নামে একটি বড় রাজ্য আছে। উদয়পুর উহার মধ্যে একটী দেশ। সেখানকার রাজা প্রতাপ সিংহের সহিত আকবরের এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আকবর জয়লাভ করেন। কিন্তু প্রতাপ আকবরের বশে আসিলেন না। তিনি স্ত্রী, পুত্র, পরিবার লইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আকবরের সৈন্যগণও তাঁহাকে ধরিবার জন্য খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া প্রতাপ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেন, এবং তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়া অন্য বনে চলিয়া যাইতেন। প্রতাপের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন কতকগুলি রাজপুত যুবক, প্রতাপকে সাহায্য করিবার জন্য দল বাধিল। এই যুবক দলের যিনি প্রধান ছিলেন, তাঁহার নাম রঘুপতি সিংহ।

রঘুপতি নিজের দল লইয়া প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছেন। একদিন শুনিতে পাইলেন, তাঁহার একমাত্র পুত্র ভয়ানক পীড়িত। সেই সংবাদ পাইয়া রঘুপতি সিংহ দেশে ফিরিলেন। বাড়ীর নিকটে গিয়া দেখিলেন, আকবরের সৈন্যেরা তাঁহার বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" তিনি নির্ভয়ে উত্তর করিলেন, "আমি রঘুপতি সিংহ।" প্রহরী বলিল, "তুমি সম্রাটের আদেশে বন্দী হইলে।" রঘুপতি বলিলেন, "বাড়ীতে আমার একমাত্র পুত্র পীড়িত। আমাকে একবার মাত্র তাহাকে দেখিবার জন্য ছাড়িয়া দাও! আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমার হস্তে বন্দী হইব।" প্রহরী দয়া করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। রঘুপতি বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন পুত্র ভয়ানক পীড়িত। জীবনের কোন আশা নাই। তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিলেন, এবং সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া প্রহরীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তুমি এখন

আমাকে বন্দী কর।” প্রহরী রঘুপতির এই সত্য রক্ষার জন্য এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিল যে, সে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিতে বলিল।

রঘুপতির সহিত প্রহরী যখন এই কথা বলিতেছিল, তখন হঠাৎ একজন মোগল সেনাপতি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রঘুপতিকে বন্দী করিলেন। তারপর প্রহরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তোমাকে যে কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে, তাহা পালন কর নাই, সুতরাং তোমাকেও বন্দী করিলাম। কাল সম্রাটের নিকট তোমাদের দুই জনের বিচার হইবে।” পরদিন আকবরের নিকটে দুইজনকেই লইয়া যাওয়া হইল। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া রঘুপতিকে বলিলেন, বীর! তুমি সত্য রক্ষা করিয়াছ। তোমার অমূল্য জীবন ঘাতকের হস্তে নষ্ট হইতে পারে না। তোমায় আমি ছাড়িয়া দিলাম। তুমি যাও, প্রতাপের সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া আমার সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিও। আমি তোমার জীবন নষ্ট করিব না। তার পর প্রহরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি বন্দীকে ছাড়িয়া দিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য পালন কর নাই। সেজন্য তোমার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত! কিন্তু তুমি সত্যের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছ। রঘুপতি সত্য রক্ষা করিয়াছেন, সেজন্য সন্তুষ্ট হইয়া, তুমি নিজের বিপদের দিকে না চাহিয়াও, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে ছিলে, সেই জন্য আমি তোমার প্রাণরক্ষা করিলাম। যাও, পুনরায় তুমি গিয়া তোমার নিজের কার্য্য কর।” আকবরের ন্যায় উদার প্রকৃতির লোক কয় জন আছেন?

পক্ষী।

পক্ষীজাতি দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদিগের সমুদয় শরীর পালকে ঢাকা। ঐ পালকগুলি আবার নানাবর্ণে চিত্রিত। ইহাদিগের শরীর

লঘু, এবং দুই পার্শ্বে দুইখানি পক্ষ আছে। সেই পক্ষের সাহায্যে ইহারা অনায়াসে শূন্যে উড়িতে পারে।

পক্ষীদিগের দুই পা। ইহাদিগের দন্ত নাই, সমস্ত খাদ্যদ্রব্য গিলিয়া খায়। ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। ঐ সকল ডিম্ব উত্তাপ পাইলে ফুটিয়া যায়। এবং তাহা হইতে ছানা বাহির হয়। প্রথমে তাহাদের বাপ মা মুখের লালা, পরে কিছু বড় হইলে তাহারা খাদ্য দ্রব্য চিবাইয়া উহাদের ঠোঁটের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। আরও কিছুদিন পরে, যখন ছানাগুলি নিজেরা খাইতে ও উড়িতে শিখে, তখন তাহাদের বাপ মার সহিত আর কোনও সম্বন্ধ থাকে না। পক্ষী সকল ধান্য, কলাই, ছাতু, ফল, কীট, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ আহার করে। শকুনি প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষী মৃত জীব জন্তুর মাংস খায়।

দেশ ভেদে নানা আকৃতি ও নানা প্রকৃতির পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কতকগুলি শিকারী। তাহাদিগের দ্বারা লোক অন্য পক্ষী ধরিয়া লয়। যেমন শ্যেন, উৎক্রোশ ইত্যাদি। কতকগুলি পক্ষী জলে সাঁতার দিয়া বেড়ায়, এবং জলমধ্য হইতে কীট পতঙ্গাদি ধরিয়া খায়। যেমন হংস, সারস, পানকৌড়ি ইত্যাদি। জলচর পক্ষীদিগের পায়ের অঙ্গুলি সকল পাতলা চর্ম্ম দিয়া জোড়া, সেজন্য জলে সাঁতার দিতে পারে। কতকগুলি পক্ষী আছে, তাহাদিগকে শিখাইলে মানুষের মত কথা কহিতে পারে; যেমন শুক, শালিক, ময়না ইত্যাদি।

পক্ষিজাতি দেখিতে যেমন সুন্দর, ইহাদিগের স্বরও তেমনি মধুর। কতকগুলি পক্ষীর স্বর কর্কশ; তদ্ভিন্ন অনেক পক্ষীরই স্বর মিষ্ট লাগে। পক্ষিগণ গাছের ডালে বাসা বাধে। পায়রা হাঁস কুক্কুট প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীকে যে স্থানে বাস করিবার জন্য দেওয়া যায়, ইহারা সেই স্থানেই থাকে। ইহারা নিজেরা বাসা নির্ম্মাণ করিতে পারে না। বাবুই

ইত্যাদি কতকগুলি পক্ষী, তাল, খেজুর প্রভৃতি গাছে অতি সুন্দর বাসা নির্ম্মাণ করে। ইহাদের বাসা নির্ম্মাণের কৌশল দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

গরু।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে গোজাতি দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। শাদা, কাল, ঈষৎ লাল, প্রভৃতি নানা বর্ণের গরু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কান বড়; গলকম্বল ঝুলিতে থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুশ্রী; পুচ্ছ দীর্ঘ এবং একগুচ্ছ লোমে ঢাকা বলিয়া দেখিতে অতিশয় সুন্দর। ইহাদের খুর জোড়া নহে। ইহাদের গায়ের লোম অতিশয় সুশ্রী, চিক্কণ ও কোমল। গোজাতি অত্যন্ত নিরীহ। তৃণ, খড়, খোল, ভূষি প্রভৃতি দ্রব্য ইহাদের খাদ্য। ইহারা মাছ মাংস খায় না। আমাদের দেশে গরুর সাহায্যে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাস্তা উত্তম হইলে ৫০।৬০ মণ ভার বোঝাই গাড়ীও ইহারা অনায়াসে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।

গাভী দুগ্ধই শিশুদিগের একমাত্র পানীয়। উহা না থাকিলে শিশু দিগের জীবনরক্ষা কঠিন হইত। দুগ্ধ অত্যন্ত বলকারক ও পুষ্টিকারক। দুগ্ধ হইতে দধি, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

গাভীরা প্রায় দশমাস কাল গর্ভধারণ করিয়া একটী সন্তান প্রসব করে। উহারা বৎসকে অত্যন্ত স্নেহ করে। গাত্রে ক্লেদ থাকিলে জিভ দিয়া চাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। বৎসের নিকটে থাকিতে পারিলে, গাভী অত্যন্ত আনন্দিত হয়। বৎসটীকে অন্যস্থানে লইয়া গেলে, তখনই সে এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া যায়।

গোজাতির দেহের সকল দ্রব্যই আমাদের উপকারে লাগে। দুগ্ধে শিশুর প্রাণরক্ষা হয়। চর্ম্মে, জুতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। হাড়ে ছুরী ও

ছাতার বাট তৈয়ার হয়। ইহার খুর ও শিং আগুনে গলাইলে শিরীষ প্রস্তুত হয়। ইহার নাড়ীতে বাদ্যযন্ত্রের তাঁত হয়। লোকে গোময় শুষ্ক করিয়া জ্বালাইয়া থাকে। কৃষকেরা গোময় সাররূপে ব্যবহার করে।

গো পৃথিবীর নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেই ইহার প্রধান বাসস্থান।

ছাগ।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ছাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে যেরূপ অসংখ্য ছাগ বাস করে, সেরূপ আর কোন স্থানে দেখা যায় না। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাগাছের পরম শত্রু! তাহা দেখিতে পাইলেই খাইয়া ফেলে। তৃণ ব্যতীত চাল, গম, ভুষি, কলাই, গাছের নরম ছাল প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য।

ছাগ গ্রীষ্মকে ভয় করে না। বরং গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহর বেলায় রৌদ্রে পড়িয়া সুখে নিদ্রা যায়। ইহারা বৃষ্টিকেও গ্রাহ্য করে না। কিন্তু প্রবল শীত পড়িলে, ইহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। বন্য ছাগ উচ্চ পর্ব্বতশিখরে বাস করে। ইহারা এরূপ চতুর যে, পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ হইতে অন্য শৃঙ্গে অনায়াসে লাফাইয়া পড়ে। অন্যান্য পশুরা মাটিতে যেরূপ অক্লেশে বেড়াইয়া বেড়ায়, ইহারাও সেইরূপ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর অনায়াসে বেড়াইয়া থাকে। আমরা ছাগ মাংস খাইয়া থাকি। ইহাদিগের মাংস অতিশয় সুমিষ্ট। কারণ ইহারা নানাপ্রকার সুগন্ধি ও সুমিষ্ট চারাগাছ ভক্ষণ করে। ছাগীর দুগ্ধ অতিশয় পুষ্টিকর। ইহাদের চর্ম্মে জুতা, বাদ্যযন্ত্র, পুস্তকের মলাট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ছাগীর চর্ম্ম অতিশয় কোমল বলিয়া তদ্দ্বারা দস্তানা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পাঁচ মাস গর্ভধারণ করিয়া প্রায়ই এককালে দুইটীমাত্র শাবক

প্রসব করে। কিন্তু সময়ে সময়ে ইহারা ৩।৪টী শাবকও প্রসব করে। ইহারা ১৩।১৪ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

কুকুর

কুকুর বড় প্রভুভক্ত। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল। ইহাদের মাথা গোল ও লম্বা। কুকুরের গোঁপ আছে। গোঁপগুলি ছোট ও কোমল। কোন কোন কুকুরের কান খাড়া থাকে। আবার কতকগুলির কান ঝুলিতে থাকে। ঘন অন্ধকারে কুকুরও বিড়ালের ন্যায় ভাল দেখিতে পায় না। কুকুরের দেহ দীর্ঘ, পা লম্বা। কুকুরের পায়ের তলায় মাংসের পুঁটুলি আছে। ইহাদের নখ বাহির হইয়া থাকে। কুকুরের দাঁত ঠিক বিড়ালের ন্যায়। ইহাদের চোয়ালের জোর এত বেশী যে উহার সাহায্যে ইহারা হাড় ভাঙ্গিতে পারে। ইহারা মাংস গিলিয়া খায়।

কুকুরের গায়ের লোম মসৃণ। সেইজন্য জলে ভিজিলে বা বাহিরে থাকিলে, কোন ক্ষতি হয় না।

কুকুরের খাদ্য নানাপ্রকার। কিন্তু মাংস পাইলে ইহারা খুব আনন্দে খায়। দুগ্ধ ও জল পান করিতে হইলে ইহারা জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া পান করে। কুকুর মৎস্য পাইলেও খাইয়া থাকে। সে লুচি সন্দেশ প্রভৃতি মনুষ্যের সুখাদ্য খাদ্য দ্রব্যও পরম আনন্দের সহিত খায়।

অত্যন্ত পরিশ্রমে কুকুরের গা দিয়া ঘাম পড়ে না। নাসিকামাত্র ঘামে ভিজিয়া যায়। অত্যন্ত গ্রীষ্মবোধ হইলে সে জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে।

কুক্কুরী দুই মাস তিনদিন মাত্র গর্ভধারণ করিয়া, এককালে ৭।৮টী

শাবক প্রসব করে। প্রসব সময়ে, শাবকগণের চক্ষু ফোটে না। প্রসব করিবার দশদিন পরে, শাবকগণের চক্ষু ফোটে।

কুম্ভীর।

কুম্ভীর অতি ভয়ানক জন্তু। ইহারা নদী, খাল প্রভৃতি জলাশয়ে বাস করে। ইহাদের শরীরের চর্ম্ম অতিশয় কঠিন। মুখে অনেক গুলি তীক্ষ্ণ দন্ত দেখা যায়। লাঙ্গুলে একপ্রকার কাঁটা আছে ইহারা চতুষ্পদ। সম্মুখে দুইপা, মনুষ্যের হাতের পাতার মত, কিন্তু পশ্চাতের দুই পা অল্প ছোট, সম্মুখের পায় চারিটী ও পশ্চাতের পায় পাঁচটী অঙ্গুলি দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেক পায়ের তিনটী মাত্র অঙ্গুলিতে নখ থাকে। ইহারা খাদ্য দ্রব্য দন্তদ্বারা ধারণ করিয়া গিলিয়া ফেলে। কোনও দ্রব্য চর্ব্বণ করে না। যখন প্রাণিগণ পিপাসায় কাতর হইয়া জল পানের জন্য, নদী বা খালের ধারে যায়, সেই সময়ে কুম্ভীরেরা তাহাদিগকে ধরিয়া জল মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাদের বল এত অধিক যে সময়ে সময়ে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী বা গরু ও মহিষদিগকেও অনায়াসে ধরিয়া তাহাদের প্রাণবধ করিয়া থাকে। যখন উহারা মানুষ বা কোন পশু না পায়, তখন মৎস্যাদি ধরিয়া খায়। ইহারা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে চড়ার উপর বালুকাময় স্থানে অনেকগুলি ডিম্ব প্রসব করে।

ইহাদের অণ্ডগুলি দেখিতে শুভ্র। কুম্ভীরিণী অণ্ড প্রসবের পর ঐ অণ্ডের প্রতি আর কোন যত্ন করে না। শৃগাল ও কুকুর প্রভৃতি জন্তু কতক ডিম্ব নষ্ট করিয়া ফেলে। সম্মুখে দেখিতে পাইলে কুম্ভীরিণী নিজেও এই সকল ডিম্বের কতক গুলি খাইয়া ফেলে। ইউরোপ দেশীয় পণ্ডিতগণ কুম্ভীরকে সরীসৃপের মধ্যে গণনা করেন।

সর্প।

সর্পের পা নাই। ইহারা বক্ষস্থলে ভর দিয়া চলে। ইহাদিগকে সরীসৃপ কহে। সর্প অতি ভয়ানক প্রাণী। সর্পজাতির মধ্যে কেউটিয়া, গোক্ষুর প্রভৃতির বিষ আছে। তাহাদের দংশনে প্রাণীদিগের জীবন নাশ হয়। আর ঢোঁড়া প্রভৃতি সর্পের বিষ নাই। সর্পের শরীর একপ্রকার মসৃণ কঠিন চর্ম্মে আবৃত। সর্প সকল ভেক, ইন্দুর, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে কতগুলি স্থলে ও কতগুলি জলে বাস করে। সময়ে সময়ে ইহারা খোলস ছাড়ে। সর্পেরা ভক্ষ্য দ্রব্য চর্ব্বণ করে না, একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলে। বিষধর কেউটিয়া ও গোক্ষুরা প্রভৃতি সর্প কোন জন্তুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করে।

সর্পেরা ডিম্ব প্রসব করে। এই অণ্ড ফুটিবার সময় সর্পের জননী শাবক গুলিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। এই সময়ে যে কয়েকটা পলায়ন করে, তাহাই জীবিত থাকে।

আমাদের দেশে পুষ্করিণীতে যে সকল ঢোঁড়া সাপ থাকে, উহাদের বিষ নাই, কিন্তু দংশন করিলে অত্যন্ত জ্বালা করে। বোড়া নামে এক প্রকার সাপ আছে, ইহারা দংশন করিলে বিষ দ্বারা গাত্রে এক প্রকার চাকা দাগ হয়। এতদ্ভিন্ন বন ও পর্ব্বতে এরূপ বৃহৎ বৃহৎ সর্প আছে যে, তাহরা অক্লেশে গো, মহিষ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুকেও ধরিয়া ক্রমশঃ ভক্ষণ করিতে পারে।

হরিণ।

হরিণ দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের শৃঙ্গ ও দীর্ঘ। চক্ষু সর্ব্বদা চঞ্চল ও রমণীয়। শরীরের লোম পটলবর্ণ ও চিক্কণ। লাঙ্গুল ক্ষুদ্র,

চারিটী পদ কৃশ ও দীর্ঘ। শরীর অতিশয় লঘু, এজন্য ইহারা অতি বেগে দৌড়িতে পারে।

ইহারা অত্যন্ত ভীরু। সামান্য শব্দ শুনিলেই পলায়ন করে। হরিণ শীত ও বসন্তকালে প্রায় জলপান করে না। শিশির ও কোমল তৃণই ইহাদিগের পিপাসা শান্তি পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ইহাদের পিপাসা এরূপ প্রবল হয় যে, সে সময়ে ইহারা জল দেখিবামাত্র তাহা পান করে। ইহারা সন্তরণে অতি পটু। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য আহার করিয়া থাকে। হেমন্তকালে ইহারা সবুজবর্ণ দূর্ব্বা, নানাবিধ পুষ্প ও কাঁটাবন অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, শীতকালে বৃক্ষের ত্বক ও শৈবাল এবং অন্য সময়ে নবীন তৃণ ও কোমল বৃক্ষপত্রই ইহাদের প্রধান খাদ্য।

হরিণ মনুষ্যের অনেক উপকার করে। লোকে ইহার মাংস খায়, ইহার চর্ম্মে জুতা, আসন ও শীতবস্ত্র নির্ম্মাণ করে। ইহার নাড়ীতে তাঁত প্রস্তুত করিয়া থাকে। হরিণের শৃঙ্গে ছুরী প্রভৃতি অস্ত্রের বাট প্রস্তুত হয়।

দেশভেদে নানাবিধ হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। লঙ্কা ও বর্ণিও দ্বীপে রক্তবর্ণ মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আকার প্রায় বৃষের ন্যায়। নেপাল, তীর্ব্বত, চীন, তাতার প্রভৃতি স্থানে কস্তূরীমৃগ নামে একপ্রকার হরিণ জন্মে। এই হরিণের নাভিদেশে একপ্রকার গোলকার গুটি জন্মে, উহাকে মৃগনাভি বলে। এই দ্রব্য অতিশয় সুগন্ধি ও নানাপ্রকার ঔষধে লাগে। ভারতবর্ষ, পারস্য, চীন ও আফ্রিকার বনে একপ্রকার বিচিত্রবর্ণ মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে কৃষ্ণসার মৃগ কহে। নরওয়ে, ল্যাপল্যাণ্ড এবং গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে একপ্রকার বৃহৎ হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে বল্লাহরিণ বলে, ইহারা উচ্চতায় তিন হস্তের কম নহে। ল্যাপল্যাণ্ড ও এস্কিমো জাতির পক্ষে

এই মৃগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহারা বরফের উপর চক্রহীন গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। ইহাদিগের দুগ্ধে তাহারা মাখন, পনির প্রভৃতি প্রস্তুত করে, ইহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া তাহারা প্রাণ ধারণ করে, এবং ইহাদের চর্ম্মে শীত নিবারণ করিয়া থাকে।

হরিণী প্রায় আট মাস গর্ভধারণ করিয়া এককালে একটীমাত্র সন্তান প্রসব করে। হরিণ ছয় বৎসরে পূর্ণবয়স্ক হয় এবং ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

ভল্লুক অত্যন্ত হিংস্র জন্তু। ইহাদের পায়ে ৪টী করিয়া অঙ্গুলি থাকে। প্রত্যেক অঙ্গুলির অগ্রভাগে সুতীক্ষ্ণ নখর আছে। ইহারা ঐ নখরের সাহায্যে অত্যন্ত দ্রুতবেগে বৃক্ষে উঠিতে পারে। ইহারা গভীর বনে, পর্ব্বতের গুহায়, কিং কোন নির্জ্জন স্থানে বাস করে। শীতকালে ইহারা আপন গর্ত্তে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে। এমন কি এ সময়ে ইহারা কোনও দ্রব্য ভক্ষণ করে না।

ভল্লুকের বুদ্ধি নিতান্ত কম নহে। ভল্লুক মনুষ্যের পোষমানে এবং যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহাই শিক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা পোষ মানিলেও সহজে ক্রুদ্ধ হয়। ভল্লুক বড়ই নিষ্ঠুর, কোন কোন বাজিকর ভল্লুকের নাসিকার রজ্জু দিয়া তাহাকে নৃত্য করাইয়া বেড়ায়। তাহাদিগের সহিত একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র থাকে, তাহা বাজালে ভল্লুক আনন্দে নৃত্য করে।

ভল্লুক মধু খাইতে অতিশয় ভালবাসে। ইহার চক্ষু শরীরের তুলনায় অতিশয় ক্ষুদ্র। ইহার চর্ম্ম কর্কশ এবং ঘন দীর্ঘ লোমে আবৃত ইহার ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল।

ভল্লুক শীতকালে কেবল ছয় সাত সপ্তাহ গর্ত্তের মধ্যে বাস করে। কিন্তু ভল্লুকী তথায় প্রায় চারিমাস কাল থাকে এবং সেই সময়ে শাবক প্রসব করে। ভল্লুক সুযোগ পাইলে আপন শাবক গুলিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। এজন্য ভল্লুকী সে সময়ে অতিশয় সতর্ক থাকে। সে তখন নিজ গর্ত্ত ত্যাগ করিয়া আপন শাবক গুলিকে অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া আসে।

ভল্লুক কৃষ্ণ ও পিঙ্গল উভয় বর্ণের দেখা যায়। তাতার, রুশিয়া প্রভৃতি স্থানে শ্বেতভল্লুক বাস করে। ইহারা নিজে মনুষ্যের কোনও উপকার করে না। কিন্তু ইহার চর্ম্ম মনুষ্যের প্রয়োজনে লাগে। শীত-প্রধান দেশের লোকেরা তদ্দ্বারা বিছানা, টুপি, আস্তানা প্রভৃতি প্রস্তুত করে। ইংলণ্ডে ইহার চর্ম্মে ঘোড়ার গাড়ীর আচ্ছাদন এবং পিস্তল রাখিবার চর্ম্মকোষ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

স্বর্ণ।

স্বর্ণ খনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন নদীর তীরে বালুকা কণার সহিত উহা মিশ্রিত থাকে। নানাপ্রকার উপায়ে উহাকে পরিস্কার করিয়া লইতে হয়। বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণ কাঁচা হরিদ্রার ন্যায়। স্বর্ণে অতি সূক্ষ্ম তার হয়। স্বর্ণের তারে ভার চাপাইয়া দিলেও উহা সহজে ছিঁড়িয়া পড়ে না। স্বর্ণকে পিটিয়া খুব পাতলা পাত করা যায়। স্বর্ণে সোহাগা দিলে অতি শীঘ্র গলিয়া যায়। বিশুদ্ধ অবস্থায় স্বর্ণ অতিশয় কোমল থাকে। এজন্য কোন অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে হইলে, ইহার সহিত তাম্র মিশ্রিত করিয়া ইহাকে কঠিন করা হয়। স্বর্ণে গিনি, মোহর প্রভৃতি মুদ্রা প্রস্তুত হয়। সকল ধাতু অপেক্ষা স্বর্ণের মূল্য অধিক।

অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা উহা উজ্জ্বল ও দুষ্প্রাপ্য। আমেরিকায় ও অষ্ট্রেলিয়ায় অনেক স্বর্ণের খনি আছে। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার কোন কোন নদীর তীরে বালুকার সঙ্গে স্বর্ণকণা দেখিতে পাওয়া যায়।

রৌপ্য।

রৌপ্য খনিতে পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহা নমনীয়, শুভ্র ও উজ্জ্বল। জলে ও বায়ুতে ইহার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় না, কিন্তু গন্ধকের সংস্রবে আসিলে ইহা মলিন হইয়া যায়। রৌপ্যে সূক্ষ্ম তার ও পাতলা পাত প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা দ্বারা টাকা, আধুলী, সিকি, দুয়ানি ও নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত হয়। কেহ কেহ রূপা দ্বারা থালা, ঘটি বাটী, গ্লাস প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিঞ্চিৎ কঠিন করিবার নিমিত্ত ইহার সহিত তামা মিশাইয়া দেওয়া হয়। মেক্সিকো, পেরু, ভারতবর্ষ, বর্ম্মা ও আফ্রিকায় অনেক রৌপ্যের খনি আছে। রৌপ্য স্বর্ণ অপেক্ষা সুলভ কিন্তু অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা মূল্যবান্।

তাম্র।

তাম্র বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ উভয় অবস্থায় খনিতে পাওয়া যায়। অবিশুদ্ধ তাম্র অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। বিশুদ্ধ তাম্রের বর্ণ ঈষৎ লাল ও উজ্জ্বল। তাম্রে পয়সা, আধপয়সা প্রভৃতি মুদ্রা ও রন্ধন পাত্র প্রস্তুত হয়। তাম্রপাত্রে রন্ধন করিলে খাদ্য দ্রব্য বিষাক্ত হয়। এইজন্য লোকে পাত্রগুলিকে রাঙের কলাই করে। আমাদের দেশে পূজার জন্য কোশা, কুশী, পুষ্পপাত্র প্রভৃতি তাম্র দ্বারা প্রস্তুত হয়।

এক ভাগ দস্তার সহিত দুই ভাগ তাম্র মিশাইলে পিত্তল হয়। আর এক ভাগ রাঙের সহিত তিন ভাগ তাম্র মিশাইলে ভাল কাঁসা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং এসিয়ায় অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে তাম্রের খনি আছে।

লৌহ।

লৌহ সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক ব্যবহারে লাগে। লৌহ না থাকিলে আমাদিগকে অসভ্য হইয়া থাকিতে হইত। লৌহ বিশুদ্ধ অবস্থায় খনিতে পাওয়া যায় না। অগ্নি ও অঙ্গারের সাহায্যে ইহাকে পরিস্কৃত করিয়া লইতে হয়। লৌহ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। লৌহ পিটিয়া নত করা যায় এবং তদ্দ্বারা সহজে নানারূপ দ্রব্য নির্ম্মাণ করা যায় অত্যন্ত তাপ দিলে লৌহ লাল বর্ণ হয়; তখন উহা দ্বার ইচ্ছামত আকারের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারা যায়। আর এক প্রকার লৌহ অছে' তাহাকে গলাইয়া ছাঁচ ঢালিয়া নানাবিধ জিনিষ গড়ান যায়। আমাদের দেশে তিন প্রকার লৌহ আছে। ঢালা লৌহ, পেটা লৌহ ও ইস্পাত। ঢালা লৌহে গ্যাসের বা জলের নল, রেলিং, বড় বড় চাকা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পেটা লৌহে কড়া, বেড়ী, হাতা, চাকারবেড়, দা, কুঠার প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, আর ইস্পাতে ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি নানাপ্রকার অস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। লৌহের সাহায্যে সমস্ত কলকারখানা প্রস্তুত হইয়াছে। পৃথিবীর নানাস্থানে লৌহের খনি আছে। লৌহ বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে কিছুদিন পরে উহাতে মরিচা ধরে।

ধান্য।

ধান্য এক প্রকার শস্য। উহা হইতে তণ্ডুল প্রস্তুত হয়। তণ্ডুল বঙ্গদেশের লোকদিগের প্রধান খাদ্য। বৎসরের মধ্যে তিনবার ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথম আশু বা আউস, দ্বিতীয় হৈমন্তিক বা আমন, তৃতীয় বোরো ধান্য। আশু ধান্য ডাঙ্গা জমিতে জন্মিয়া থাকে। বৈশাখ মাসে আশু ধান্যের বীজ বপন করিতে হয়। ভাদ্র মাসে শস্য পাকিয়া উঠিলে, কৃষকেরা গাছগুলি কাটিয়া লয়। আমন ধান্য ডাঙ্গা ও বিল উভয় স্থানেই জন্মে। কৃষকেরা মাঘ, ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে প্রথম বৃষ্টি হইলে সকল ভূমিতে দুইবার কর্ষণ করিয়া সার দেয়। ভূমি উত্তমরূপে কর্ষণ না করিলে শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে না।

হৈমন্তিক ধান্যের চাষ দুই প্রকার;—যথা, বোনা ও রোয়া। কৃষকগণ জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান্যের বীজ ধুলায় অল্প অল্প করিয়া বপন করে, ইহাকে লোকে বোনা ধান্য কহে। আর এই জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে কিয়ৎপরিমাণ ভূমিতে অত্যন্ত ঘন করিয়া বীজ ধান্য বপন করে; এই ক্ষেত্রকে তলা বলে। তলা ভূমির চারা অর্দ্ধহস্ত উচ্চ হইলে, কৃষকেরা আষাঢ় মাসে উহা তুলিয়া অন্য সজল কর্ষিতক্ষেত্রে পুনরায় রোপণ করিয়া থাকে। ইহাকেই রোয়া ধান কহে। আমন ধান্য কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে পাকে। কৃষকেরা বোরো ধান্য পৌষ মাসে রোপণ করিয়া বৈশাখ মাসে কাটিয়া লয়। কৃষকেরা ধান্যের গাছ কাটিয়া ঐ জমিতেই দুই চারিদিন ফেলিয়া রাখে। পরে আটি বাঁধিয়া গৃহে আনে ও সাজাইয়া রাখে। উহাকে ধানের গাদা বা পালা বলে। তার পর এই আটিধান্য পাটায় ঝাড়িয়া শস্য সকল পৃথক করিয়া লয়। কোন কোন কৃষক ধান্যের শীষগুলি কাটিয়া আনে। পরে গোরুর দ্বারা মড়াই করাইয়া বা পায়ের

দ্বারা মাড়াইয়া ধান্য পৃথক করে। খড় বা বিচালীগুলি গোরুর খাদ্যের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে।

ধান্য নানাপ্রকার; যথা,—পরমান্নশালী, বালাম, নটকান, বাঁশফুল দুর্গাভোগ, কনকচুর, বাঁকতুলসা, দাদখানি, সূর্য্যমণি, রাঁধুনীপাগল, গোবিন্দভোগ, বাঁশমতি, মুক্তাহার, লাউশালী ইত্যাদি।

চাউল দুই প্রকার; যথা,—আতপ ও সিদ্ধ। রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ধান্য হইতে যে চাউল বাহির করা হয়, তাহাকে আতপ চাউল কহে। আর সিদ্ধ করিয়া পুনরায় রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ধান্য হইতে যে চাউল বহির করা হয়, তাহার নাম সিদ্ধ চাউল।

ধান্য হইতে চাউল বাহির করিবার সময় তিনটী দ্রব্য পাওয়া যায়; যথা,—তুষ খুদ ও কুড়া। ধান্যের খোসার নাম তুষ, চাউলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার নাম খুদ। আর চাউল কাঁড়িলে যে গুঁড়া বাহির হয়, তাহার নাম কুঁড়া। এই তিন প্রকার দ্রব্যই গো, মহিষ প্রভৃতি পশুর খাদ্য।

গোধূম বা গম।

গোধূমের চাস করিতে হইলে আশ্বিন মাসে ক্ষেত্রে প্রচুর সার দিতে হয়। নদীর নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রে কোনরূপ সার দিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ বন্যায় ভূমির উপর যে পলি পড়ে, উহাতেই ভূমি উর্ব্বরা হয়। সুতরাং ঐ স্থানের কৃষক দিগকে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া জমির চাস দিতে হয় না।

নদীর নিকটবর্ত্তী ভিন্ন অন্যান্য ভূমি লাঙ্গল দিয়া দুই তিনবার কর্ষণ করিয়া ও মই দিয়া মৃত্তিকা সমতল করিতে হয়। সচরাচর বপনের পূর্ব্বে গমবীজ একদিন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। কার্ত্তিক মাসেই বপনের

উপযুক্ত সময়। বপনের পর ক্ষেত্রে আর একবার লাঙ্গল দিয়া মই দিতে হয়। তাহাতে বীজগুলি মৃত্তিকার দ্বারা ঢাকিয়া যায়।

ফাল্গুন মাসে ফল পাকিয়া উঠে। ইহার মধ্যে ক্ষেত্রে তিববার জল সেচন আবশ্যক। প্রথমতঃ বীজের অঙ্কুর বাহির হইবার পর, তাহার পর শীষ নির্গত হইবার সময়, তৎপরে শস্য পকিবার উপক্রম হইলে জলসেচন আবশ্যক। নতুবা শস্যসকল সুন্দর পুষ্ট হয় না।

পশ্চিম উত্তর প্রদেশে কৃষকেরা সচরাচর আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে পাঁচ ছয় বার চাষ দেয় এবং ভূমি উর্ব্বরা করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে সার ফেলে। তথায় প্রয়ই কূপ হইতে জল তুলিয়া কৃষকেরা শস্যক্ষেত্রে সেচন করে। প্রথম জল সেচনের পর মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে, একবার মাত্র কোদাল দিয়া সামান্যরূপে মৃত্তিকা খনন করিয়া তৃণাদি তুলিয়া ফেলে। অন্য তৃণাদি জন্মিলে ঐ জমির উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হয়। গমের গাছ ধান্যের গাছের ন্যায় প্রথমে হরিদ্বর্ণ হয়। ইহার শীষও ধান্যের শীষের মত। কিন্তু ইহাতে শুঁয়া হইয়া থাকে।

শস্য পাকিবার উপক্রম হইলে গাছগুলি আর হরিদ্বর্ণ থাকে না। কৃষকেরা গোধূমের গাছ সকল কাটিয়া, বলদ দ্বারা মাড়াই করাইয়া শস্য পৃথক করিয়া লয়। গম হইতে আটা, ময়দা ও সুজী প্রস্তুত হয়। এই তিন প্রকার গম চূর্ণই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর।

আম্র।

আম্র ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে। আম্রের ন্যায় সুমিষ্ট ফল বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই। সুপক্ক আম্রের যে কত গুণ তাহা বলা যায় না। ক্ষুদ্র ওবৃহৎ নানা প্রকারের আম্র দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে তিন প্রকারে আম্রবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। মৃত্তিকায় ফেলিয়া

রাখিলে আম্রের আঁটি হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। সেই অঙ্কুর বৰ্দ্ধিত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়। সচরাচর লোকে আম্রের যোড় কলমই প্রস্তুত করিয়া থাকে। যোড় কলম বাঁধিতে হইলে দুই তিন বৎসরের আম্রের চারা সংগ্রহ করিতে হয়। চারা যেরূপ স্থূল, যে বৃক্ষের শাখায় কলম বাঁধিতে হইবে তাহাও সেইরূপ হওয়া চাই, তাহা হইলে সহজে যোড় বাঁধিবে। চারার ও বৃক্ষের শাখা তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়া একটু চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে। পরে উভয়ের ঐ অংশ একত্র করিয়া পাট কিংবা কলার ছোট্ দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। উহার উপর এঁটেল মাটির প্রলেপ অথবা তার্পিণ রজন মিশাইয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া প্রলেপ দিলে, ১৫।১৬ দিনের মধ্যে যোড় বাঁধিয়া যায়। তখন চারার মাথা কাটিয়া দিতে হয়। আর ১০।১২ দিন পরে বৃক্ষ হইতে শাখাটীকে কাটিয়া ফেলিলে যোড়-কলম প্রস্তুত হইল। আম্রশাখাখার সন্ধিস্থলে গোময়, মৃত্তিকা খৈল ও পচামাছ ইত্যাদি দ্রব্য একত্র মিশাইয়া চটে করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে, কিছু দিন পরে ঐ স্থান হইতে শিকড় বাহির হয়, তখন উহা কাটিয়া মৃত্তিকায় রোপণ করিতে হয়।

পৌষমাসের শেষে আম্র মুকুল জন্মে। অল্প কোয়াসায় মুকুল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু গাঢ় কোয়াসা হইলে নষ্ট হইয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উৎকৃষ্ট আম্র পাওয়া যায়। আম্র নানা প্রকার, যথা,—ফজলী, ন্যাংড়া, গোপালভোগ, বোম্বাই কিষণ্‌ভোগ, গোপালেধোপা, মোহনভোগ, কাঁচামিঠে, ক্ষীরপুলি, ভাদুরি ইত্যাদি।

আম্র বৃক্ষ আমাদিগের অনেক উপকারে লাগে। ইহার গুঁড়ি চিড়িয়া আমরা তক্তা করি। আবার সেই তক্তায় বাক্স, সিন্দুক, কপাট, তক্তপোষ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করি। ইহার শাখা প্রশাখা আমরা জ্বালাইয়া থাকি।

সুপক্ব আম্র উৎকৃষ্ট খাদ্য। আম্র ফল হইতে লোকে কাসুন্দি, আমসত্ব প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে।

ইক্ষু।

ইক্ষু নানা প্রকার আছে। আমাদের দেশে বোম্বাই, খাগড়াই, কাজলা, সামসাড়া, কামরাঙ্গা প্রভৃতি ইক্ষু জন্মে। ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই ইক্ষুর চাস হইয়া থাকে। মাঘ মাসের শেষে বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে বৃষ্টি হইলে কৃষকেরা জমিতে বার বার লাঙ্গল ও মই দিয়া তাহার মাটি ধূলায় মত করিয়া ফেলে, এবং ঘাস ও আগাছা সকল তুলিয়া ফেলিয়া দেয়। প্রথম বার চাসের সঙ্গে সঙ্গে জমিতে বিঘা প্রতি ৭০।৮০ মণ করিয়া শুষ্ক গোবর সার দেয়। শেষে ক্ষেত্রে চারি হস্ত অন্তর দাড়া পাটি, পৈ বা জুলি প্রস্তুত করে। উহার মধ্য কিছু কিছু দূর অন্তর সামান্য গর্ত্ত খনন করে। এই সকল গর্ত্তে জল ও খোল দেয় এবং ইক্ষুর ডগা গুলি পুতিয়া মৃত্তিকার দ্বারা উহার গোড়া ঢাকিয়া দেয়। ডগার চোক বা এখো হইতে অঙ্কুর বাহির হইলে ক্ষেত্রে জলসেচন করিতে হয়। চারাগুলি দেড় হাত পরিমাণ বড় হইলেই, তাহাদের গোড়ায় কিছু কিছু খৈলের গুঁড়া দিয়া মাটী খুসিয়া দিতে হয়। চারাগুলি বেশ সতেজ হইয়া উঠিলে, এবং আট নয়টি করিয়া পাতা বাহির হইলে, সমস্ত জমি ভাল করিয়া কোদলাইয়া দিতে হয়, এবং দুই সারির মধ্য হইতে মাটি তুলিয়া চারার গোড়ায় দিতে হয়। পরে প্রত্যেক চারার গোড়া হইতে আট দশটী ফেঁকড়ি বাহির হইবে। সে গুলি বড় হইলে গোড়ার পাতা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। পরে উপরের পাতা দিয়া তিন চারি গাছা ইক্ষু একত্র জড়াইয়া দিতে হয়। ইহার পর আর কোন পাইটের আবশ্যক হয় না। কিন্তু বৃষ্টি হইলে যাহাতে জমিতে জল বাধিয়া না থাকে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

এদেশে ইক্ষুরস বাহির করিবার জন্য লোকে শাল নামক কাষ্ঠনির্ম্মিত এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে। উহার মধ্যে একবারে পাঁচ ছয় খানি ইক্ষু দিয়া দুইজন লোকে হাত ও পা দিয়া ঘুরাইতে থাকে। এইরূপ করিলে ইক্ষুরস বাহির হয়। ইক্ষুরস আগুনে জ্বাল দিলে গুড় প্রস্তুত হয়; এবং এই গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গোল আলু।

গোল আলু অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ইহার চাসেও বিশেষ লাভ হয়। চব্বিশপরগণা, হুগলি, বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বিস্তর আলুর চাস হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালার অন্যান্য জেলার লোক আলুর চাস এক প্রকার করে না বলিলেই হয়।

পরিষ্কৃত পাতলা নূতন পলিপড়া জমি আলু চাসের পক্ষে উৎকৃষ্ট। এইরূপ ভূমিতে সারের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। দো আঁশ মৃত্তিকায় আলু জন্মাইতে হইলে, আশ্বিন মাসে জমি খনন করিয়া তাহাতে চূণ, বালি, খৈল ও গোবরের সার প্রচুর পরিমাণে দেওয়া উচিত। হাড়ের গুঁড়া আলুর পক্ষে উৎকৃষ্ট। যে মাটি বার মাস ভিজা থাকে, সেখানে আলু জন্মে না। এজন্য নিম্ন জমিতে ইহার চাস করা উচিত নহে। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা প্রায় এক হস্ত গভীর করিয়া খনন করা উচিত। মৃত্তিকা যতই চূর্ণ হয়, ততই ফসলের পক্ষে ভাল। তৎপরে এক এক হস্ত অন্তর, উত্তর দক্ষিণে লম্বা এক একটী নালা প্রস্তুত করা আবশ্যক। নালার গভীরতা আধ হাত হইলেই চলিবে। প্রত্যেক নালার মধ্যে ১৫।১৬ অঙ্গুল অন্তর এক একটী বীজ আলু বসাইতে হয়। বীজ রোপণ সময়ে, যে দিকে অধিক চোক থাকিবে, সেই দিক উপরে রাখিয়া মাটি চাপা দিতে হয়।

বর্ষাকালের পর, আশ্বিন মাসের শেষে, বীজ রোপন করা যাইতে পারে। নতুবা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে রোপণ করিতে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত অঙ্কুর বাহির না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বীজের উপর অল্প পরিমাণে জল সেচন করিতে হয়। অধিক জল দিলে বীজ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

বীজে যতগুলি চোক থাকে, প্রায় সকল গুলি হইতেই অঙ্কুর বাহির হয়। এইরূপে এক একটী বীজ হইতে এক এক ঝাড় চারা জন্মে। তন্মধ্যে নিস্তেজ চারা গুলি ভাঙ্গিয়া দিলে, অবশিষ্ট চারা গুলি অত্যন্ত সতেজ হয়। অগ্রহায়ণ মাসের শেষে বা পৌষ মাসের প্রথমে আলু তোলা যাইতে পারে।

পরে মাঘ মাসে পুনর্ব্বার ফসল তুলিতে হয়। এই সময়ে সমুদয় আলু তুলিয়া ফেলা উচিত। গাছ শুকাইয়া গেলে ফসল তোলা ভাল। পর পর দুই বৎসর এক জমিতে আলুর চাস করিলে, দ্বিতীয় বৎসরে ফসল একটু বড় হয়। আলুর চাসে বিঘা প্রতি ৫০৲ টাকা লাভ হয়।

সূর্য্য।

আকাশে সূর্য্যকে যেন খুব বড় একটী জ্বলন্ত ভাঁটার ন্যায় দেখায়। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক গুণ বড়। আমরা সূর্য্য হইতে আলোক ও তাপ পাই। সূর্য্যের আলোকেই আকাশ নীল বর্ণ দেখায়। যদি সূর্য্য না থাকিত, তাহা হইলে, পৃথিবীর সমস্ত বস্তু চিরকাল অন্ধকারে থাকিত। বর্ষাকালে দুই এক দিন সূর্য্য না উঠিলে, আমাদের কত কষ্ট বোধ হয়; আর যদি চির দিন পৃথিবী অন্ধকারে থাকিত, তাহা হইলে আমরা কখন বাঁচিতে পারিতাম না। সূর্য্য হইতে তাপ না পাইলে আমরা জীবিত থাকিতে পারিতাম না, অন্যান্য জীব জন্তুও

মরিয়া যাইত, বৃক্ষ, লতা, ফুল, ফল কিছুই জন্মিত না। সূর্য্য প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদিগকে আলোক দিয়া থাকে। সূর্য্যের এত তেজ যে, আমরা অনেকক্ষণ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি না, চক্ষু যেন ঝলসিয়া যায়, কিছুক্ষণ আর ভাল দেখিতে পাওয়া যায় না। সূর্য্য সকল সময়ে একরূপ থাকে না। আকাশ নির্ম্মল থাকিলে উহার রং স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ দেখায়। কিন্তু প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাবেলায় সূর্য্যের রং অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ। দ্বিপ্রহর কালে সূর্য্য ঠিক আমাদের মস্তকের উপরে থাকে। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়কে আমরা পূর্ব্বাহ্ণ ও দ্বিপ্রহরের পর সন্ধ্যার পূর্ব্ব সময়কে অপরাহ্ণ বলি। দ্বিপ্রহর সময়কে মধ্যাহ্ণ বলিয়া থাকি। সূর্য্য দ্বারা আমরা দিক নির্ণয় করিতে পারি। যে দিকে সূর্য্য উদিত হয়, তাহাকে পূর্ব্ব ও যে দিকে অস্ত যায়, তাহাকে পশ্চিম দিক বলে। প্রাতে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে, যে দিকে আমাদের দক্ষিণ বাহু থাকে, সেই দিক দক্ষিণ; আর যে দিক বাম বাহু থাকে, সেই দিককে উত্তর দিক বলে।

চন্দ্র।

চন্দ্র সূর্য্যের মত গোল কিন্তু তত বড় নহে। চন্দ্রের কিরণ শীতল, চন্দ্রের কিরণকে জ্যোৎস্না কহে। সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটে আছে, এজন্য উভয়ের আকার সমান বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময়, কোন কোন দিন সন্ধ্যার পর, কোন কোন দিন বা কিছু রাত্র হইলে আমরা আকাশে চন্দ্র দেখিতে পাই। মাসের মধ্যে এক রাত্রে পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাত্রকে পূর্ণিমার রাত্র বলে। আর যে রাত্রে আদৌ চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই রাত্রকে অমাবস্যার রাত্র বলে। অমাবস্যার পর দিন সন্ধ্যার সময়

পশ্চিম আকাশে চন্দ্র উদিত হয় বটে, কিন্তু এত অল্প সময় চন্দ্র আকাশে থাকে, যে আমরা দেখিতে পাই না। পর দিন সন্ধ্যার সময় ঠিক একখানি কাস্তের মত দেখায়। কিন্তু অধিকক্ষণ দেখা যায় না। এইরূপে প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া চন্দ্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ১৪ দিন পরে সম্পূর্ণ গোল হইয়া আকাশে উদিত হয়। এই ১৫ দিনকে শুক্লপক্ষ কহে। পূর্ণিমার পর হইতে প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া চন্দ্রের হ্রাস হইতে থাকে, এবং ১৪ দিন পরে আকাশে আদৌ চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় না, সমস্ত রাত্রি ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন থাকে। এই ১৫ দিনকে কৃষ্ণপক্ষ বলে।

বর্ণশুদ্ধি।

সন্ধি—মুনীন্দ্র, মহীন্দ্র, অধীশ্বর, গিরীন্দ্র, অভীষ্ট, প্রতীতি, অতীব, অতীন্দ্রিয়, বারীন্দ্র, প্রতীক্ষা, গিরীশ, ক্ষিতীশ, পৃথিবীশ্বর, অতীত, নীরস, নীরব, নীরোগ, নীরদ। ভানূদয়, কটূক্তি, বধূক্তি, বিধূদয়, লঘূর্ম্মি, রূঢ়, মূঢ়।

যদ্যপি, ইত্যাদি, অত্যাচার, অত্যুক্তি, প্রত্যেক, পর্য্যালোচনা, অত্যন্ত, অন্বেষণ, অন্বয়, অন্বিত, স্বাগত।

নিশ্চয়, নিশ্চিত, শিরশ্ছেদ, ধনুষ্টঙ্কার, নিষ্ঠুর, আকৃষ্ট, ষষ্ঠ।

কিংবা, সংযত, বশংবদ, প্রিয়ংবদ, সংবাদ, সংলাপ।

বৃক্ষচ্ছায়া, পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ, আচ্ছাদিত, বিচ্ছিন্ন, সন্দেহ, সন্তাপ, সঙ্গত।

ষণ্মাস, ষণ্মাতুর, সংস্কার, পরিষ্কার, দ্যুলোক, দ্যুনিবাস।

ইতস্ততঃ, মনস্তাপ, নিস্তার, নিস্তেজ, নিষ্কাম, আবিষ্কার, নিষ্ফল, আবিষ্কৃত, নিষ্পত্তি, বহিষ্কৃত, দুষ্কৃতি, চতুষ্কোণ, চতুষ্পদ, ধনুষ্পাণি, গোষ্পদ, ভ্রাতুষ্পুত্র, চতুষ্টয়, নমস্কার, পুরস্কার, তিরস্কৃত, শ্রেয়স্কর, মনস্কার, যশস্কর, ভাস্কর, বাচস্পতি, বনস্পতি, মনীষা, আস্পদ, তস্কর, বৃহস্পতি, আশ্চর্য্য, প্রায়শ্চিত্ত, হরিশ্চন্দ্র, পরস্পর, ষোড়শ।

অন্তঃপাতী, অন্তঃকরণ, প্রাতঃকৃত্য, পুনঃপুনঃ, প্রাতঃকাল, পয়ঃপ্রবাহ, পুনঃপ্রাপ্ত।

মনোহর, মনোমোহন, অহোরাত্র, সরোজ, পুরোভাগ, অধোগতি, সদ্যোজাত।

ণত্ববিধান—ঋণ, তৃণ, সঙ্কীর্ণ, উত্তীর্ণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, বিস্তীর্ণ, বর্ণ, ব্রাহ্মণ, অর্পণ, রোপণ, আরোহণ, দর্পণ, কৃষাণু, প্রাহ্ণ, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, রামায়ণ, পরায়ণ, নারায়ণ, অগ্রণী, আম্রবণ, অগ্রেবণ।

প্রণাম, পরিণাম, প্রণয়, প্রণব, প্রাণ, পরিণয়, প্রণতি, নির্ণয়, অগ্রহায়ণ, প্রণিপাত, প্রণিধান, প্রয়াণ, নির্ব্বাণ, বিষণ্ণ, ক্ষুণ্ণ।

ষত্ববিধান—শুশ্রূষা, মুমূর্ষু. নিষ্পত্তি, পরিষ্কার, শ্রীকরকমলেষু, অনুষ্ঠান, নিষেধ, অভিষেক, বিষাদ, দুর্ব্বিষহ।

ঘর্ষণ, পোষণ, ভীষণ, দ্বেষ, বর্ষণ, রোষ, শ্লেষ, বর্ষা, ঈর্ষা, মাতৃষসা, পিতৃষসা, শিষ্য, সুষুপ্ত, যুধিষ্ঠির, সুষমা, বিষয়, গোষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, কুষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ। দুষ্কর, আবিষ্কার, বহিষ্করণ, চতুষ্পথ।

লিঙ্গ—কদলী, সৌদামিনী, পৃথিবী, বল্লী, লক্ষ্মী, শ্রী, চাতুরী, মাধুরী, ধী, শ্রেণী, রজনী, গোদাবরী, বিভাবরী, আবলী, শর্ব্বরী, বিদুষী, অবনী, পত্নী, ভবানী, ইন্দ্রাণী, সামগ্রী, ব্রাহ্মণী, ঈশ্বরী, শিবানী, নারী, সখী, সাধ্বী, সিংহী, শূকরী, হরিণী, চণ্ডী, ধরণী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, ধূলি, ভূমি, শ্বশ্রূ, বধূ।

স্বর্ণময়ী, তাদৃশী, ষোড়শী, বিদ্যাবতী, পয়স্বিনী, বিধাত্রী, নদী, দেবী, গৌরী, শাশুড়ী, খুড়ী।

তদ্ধিত—দেশীয়, মদীয়, বঙ্গীয়, মেধাবী, যশস্বী, তপস্বী, শিখী, লোভী, আত্মীয়, দ্বিতীয়, তৃতীয়, একাকী, ঘনীভূত, লঘুকরণ, ইদানীন্তন, নবীন, স্বীয়।

দাশরথি, সৌমিত্রি, ক্ষত্রিয়, মানসিক।

কৃৎ—পানীয়, করণীয়, শ্রবণীয়, স্থায়ী, দ্বেষী, প্রতিবাদী, সত্যবাদী, সহগামী, ভাবী, আগামী, শ্রমী, যোগী, ত্যাগী, সংসারী, সেনানী, কীদৃশ, ঈদৃশ, ক্ষীণ, স্ফীত, গৃহীত, বিস্তীর্ণ, গীত, হীন, পীত, জীর্ণ, নীহার, নিশীথ, স্বামী, প্রতীহার, বীভৎস, মীমাংসা, জিগীষা, সরীসৃপ, আসীন।

আত্মম্ভরী, যুক্তি, গ্লানি, সহিষ্ণু, বর্দ্ধিষ্ণু, কৃত্রিম, নিধি, বিধি, ম্রিয়মাণ, স্বয়ম্ভূ, আরূঢ়, মূঢ়, গূঢ়, আহূত, পূর্ণ, চূর্ণ, জাগরূক, চূড়া, মুমূর্ষু, শুশ্রূষা, শম্ভু, বিভু, ভুক্ত, সুপ্ত, জিষ্ণু, ভীরু, বিধু, ইন্দু, রিপু, পশু, সেতু, স্থাণু, ভানু, পুণ্য।

সমাস—সমীপ, প্রতীপ, অন্তরীপ, নীহার, নীবার, প্রতীকার, অন্তেবাসী, পঞ্চবটী, চতুষ্পদী, হস্তিমূর্খ, পক্ষিজাতি, গুণিগণ, শূলপাণি, চক্রপাণি, সুগন্ধি, যুধিষ্ঠির, সরসিজ, মনসিজ, ষষ্ঠিদাস, দেবিদাস, কালিদাস, ভ্রুকুটী, দম্পতী।

সম্বোধন—জানকী—অয়ি জানকি, নদী—হে নদী, বধূ—হে বধু, মুনি—হে মুনে।

অশুদ্ধি সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
যদ্যপিও	যদ্যপি, যদিও	পাপীগণ	পাপিগণ
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	পক্ষীজাতী	পক্ষিজাতি
অনাটন	অনটন	রাজাগণ	রাজগণ
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	মহিমাবর	মহিমবর
উচ্ছন্ন	উৎসন্ন	শশীকুমার	শশিকুমার
একত্রিত	একত্র	নির্দ্দোষী	নির্দ্দোষ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঐক্যতা	ঐক্য	নিরপরাধী	নিরপরাধ
সক্ষম	ক্ষম	প্রবীণ বৃক্ষ	প্রকাণ্ড বৃক্ষ
সবিনয়পূর্ব্বক	বিনয়পূর্ব্বক বা সবিনয়ে	অধীনস্থ	অধীন
পূজ্যাস্পদ	পূজাস্পদ	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট
সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য	দুরাবস্থা	দুরবস্থা
কম্পবান্	কম্পমান্	দাশরথী	দাশরথি
কিম্বা	কিংবা	দিবারাত্রি	দিবারাত্র
জাগরুক	জাগরূক	দিবানিশি	দিবানিশ
জগবন্ধু	জগদ্বন্ধু	ধৈর্য্যতা	ধৈর্য্য
জ্ঞানমান্	জ্ঞানবান্	নিন্দুক	নিন্দক
নিরোগী	নীরোগ	সন্মত	সম্মত
পিতামাতা	মাতাপিতা	সন্মান	সম্মান
পিতৃমাতৃহীন	মাতাপিতৃহীন	অজানিত	অজ্ঞাত
পুরষ্কার	পুরস্কার	যাবদীয়	যাবতীয়
ভাগ্যমান্	ভাগ্যবান্	সমতুল	সমবা তুল্য
নিশির	নিশার	পর্য্যটক	পর্য্যাটক
মাহাজন	মহাজন	ক্রেতাগণ	ক্রেতৃগণ
মান্তনীয়	মাননীয়	বয়ক্রম	বয়ঃক্রম
মহাত্মাগণ	মহাত্মগণ	বশম্বদ	বশংবদ
মহারাজা	মহারাজ	বারম্বার	বারংবার
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ	বাহ্যিক	বাহ্য
ভুজঙ্গিনী	ভুজঙ্গী	সম্বরণ	সংবরণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ		শুদ্ধ
রাজাগণ	রাজগণ	সুস্পষ্ট	
লাঘবতা	লাঘব	সৌজন্যতা	সৌজন্য।

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(১)	তোমার পত্র পাইয়া সন্তোষ হইলাম।	তোমার পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম।
(২)	আমার অর্থের আবশ্যক কি ?	আমার অর্থের আবশ্যকতা কি ?
(৩)	শঠের সহিত মৈত্রতা করিও না।	শঠের সহিত মিত্রতা করিও না।
(৪)	তুমি পরীক্ষায় পারকতা হইয়াছ।	তুমি পরীক্ষায় পারগ হইয়াছ।
(৫)	লৌহ আমাদের অত্যন্ত ব্যবহার্য্যনীয়	লৌহ আমাদের অত্যন্ত ব্যবহার্য্য।
(৬)	সকল কার্য্যই সাবধানপূর্ব্বক করা উচিত।	সকল কার্য্যই সাবধানে করা উচিত।
(৭)	সে বিদায় হইয়াছে।	সে বিদায় লইয়াছে।
(৮)	আমি আরোগ্য হইয়াছি।	আমি আরোগ্যলাভ করিয়াছি।
(৯)	তৎকালীন আমি তথায় ছিলাম না।	তৎকালে আমি তথায় ছিলাম না।
(১০)	তিনি সেখানে যাইতে মনঃস্থ করিয়াছেন।	তিনি সেখানে যাইতে মনস্থ করিয়াছেন।

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(১১)	তিনি দোষী কি নির্দ্দোষী তাহা আমি জানি না।	তিনি দোষী কি নির্দ্দোষ তাহা আমি জানি না।
(১২)	দুষ্ট লোকের বাহ্যিক ও আন্তরিক ভাব বুঝা যায় না।	দুষ্ট লোকের বাহ্য ও আন্তরিক ভাব বুঝা যায় না।
(১৩)	এক সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বনে প্রবেশ হইয়া প্রবীণ এক বটবৃক্ষের সৌন্দর্য্যতা দেখিয়া বিস্ময় হইয়াছিল।	এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বনে প্রবিষ্ট হইয়া বা প্রবেশ করিয়া প্রকাণ্ড এক বট বৃক্ষের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।
(১৪)	যিনি নীচ লোককে কটুক্তি করেন তিনি অপমান হইবার ভয় রাখেন না।	যিনি নীচ লোককে কটূক্তি বলেন তিনি অপমানিত হইবার ভয় করেন না।
(১৫)	আগত কল্য আমি বাড়ী যাইব।	আগামী কল্য আমি বাড়ী যাইব।
(১৬)	যখন রাম অতি শৈশব ছিলেন তখন লেখাপড়ায় মন দিতেন।	যখন রাম অতি শিশু ছিলেন তখন লেখা পড়ায় মন দিতেন।
(১৭)	বিদ্যান্ ব্যক্তি সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করেন।	বিদ্বান ব্যক্তি সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করেন।
(১৮)	তিনি কি ব্যবসা করেন ?	তিনি কি ব্যবসায় করেন ?
(১৯)	আমার দুরাদৃষ্ট বলিতে হইবে।	আমার দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে।
(২০)	বিপদকালীন ধৈর্য্যবলম্বন করিবে।	বিপদকালে ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে।

বাক্য প্রকরণ।

১। বাক্য ত্রিবিধ।—সরল, মিশ্র ও যৌগিক।

২। যে বাক্যে একটী উদ্দেশ্য ও একটী বিধেয় থাকে, তাহাকে সরল বাক্য কহে। যথা ;—হরি যাইতেছে।

৩। একটী প্রধান বাক্য এবং তদন্তর্গত এক বা ততোধিক অপ্রধান বাক্যের মিশ্রণে যে বাক্য হয়, তাহাকে মিশ্র বাক্য কহে। যথা,—যখন আমি স্কুলে গিয়াছিলাম, তখন ১১টা বাজিয়াছিল। এখানে "১১টা বাজিয়াছিল". এইটী প্রধান বাক্য এবং "যখন আমি স্কুলে গিয়াছিলাম— এই বাক্য উক্ত প্রধান বাক্যের অধীন।

৪। দুই বা ততোধিক নিরপেক্ষ সরল বাক্য বা মিশ্র বাক্যের যোগে উৎপন্ন বাক্যকে যৌগিক বাক্য কহে। যথা,—শিক্ষক বিদ্যালয়ে আসিলেন ও ছাত্রটীকে ভৎ´সনা করিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষণ ও সীতা বনে গমন করিলেন। নিরপেক্ষ বাক্যগুলি ও, এবং, কিন্তু, বা প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়।

দুই বা ততোধিক সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হইলে সর্ব্বত্র যৌগিক বাক্য হয় না। যথা,—তাম্র ও রাঙে কাঁসা হয়। দুই আর একে তিন হয়। এইগুলি সরল বাক্য যৌগিক বাক্য নহে।

৫। উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত উপায়ে সংপ্রসারিত হইতে পারে।

(ক) বিশেষণ—ধার্ম্মিক লোক সুখে থাকেন।

(খ) সম্বন্ধ পদ—আমার পিতা আসিতেছেন।

(গ) সমকারক—আমার পুত্র যদু এই বিদ্যালয়ে পড়ে।

(ঘ) বিশেষণ ভাবে পরিচায়ক বাক্যাংশ—'আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক' লোক জগতে বিরল।

(ঙ) অসমাপিকা ক্রিয়া ও তাহার সহিত সম্বন্ধ বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ—'বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইয়া' কোন্ ব্যক্তি এরূপ কার্য্য করে?

(চ) হেতুবোধক অসমাপিকা ক্রিয়া—তোমার 'যাইতে' ইচ্ছা নাই।

৬। বিধেয় নিম্নলিখিত উপায়ে সংপ্রসারিত হইতে পারে।

(ক) ক্রিয়ার বিশেষণ—সে দ্রুত যাইতেছে।

(খ) বিশেষণের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত ক্রিয়ার বিশেষণ—সে বড় ধূর্ত্ত।

(গ) বিশেষণ ভাবে পরিচয়াক বাক্যাংশ—রজনী প্রভাত হইলে, সকলে বনে গমন করিলেন।

(ঘ) তৃতীয়াদি বিভক্তিযুক্ত পদ—তিনি অস্ত্রদ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিলেন। পর্ব্বত হইতে নদী উৎপন্ন হয়। আমি বিদ্যালয়ে গিয়াছিলাম।

৭। সকর্ম্মক ক্রিয়া স্থলে কর্ম্মপদ বিধেয়ের পূরক হয়। আর অকর্ম্মক ক্রিয়া স্থলে, বিধেয় বিশেষণ, সমকারক ও ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পদ বিধেয়ের পূরক হয়।

(ক) কর্ম্মপদ—আমি পুস্তক পড়িব।

(খ) বিধেয় বিশেষণ—তিনি পরম জ্ঞানী ছিলেন।

(গ) সমকারক—সপ্তম এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন।

(ঘ) ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পদ—এই পুস্তকখানি তাঁহার।

প্রশ্ন।

১। নিম্নলিখিত বাক্য গুলির উদ্দেশ্য সমূহকে সংপ্রসারিত কর।

(ক) মাতা যাইতেছেন। (খ) হরি ব্যাকরণ পড়ে। (গ) নিঃস্বার্থ লোক জগতে বিরল। (ঘ) পরোপকারী জগতের অলঙ্কার। (ঙ) ধার্ম্মিক

লোক পৃথিবীর অলঙ্কার। (চ) সত্যবাদী সমাজের ভূষণ। (ছ) মিথ্যাবাদী পৃথিবীর কণ্টক। (জ) তোমার ক্ষতি কি? (ঝ) তোমার মানস নাই। (ঞ) তোমার শক্তি নাই। (ট) তাহার বল নাই। (ঠ) মনুষ্য বাক্‌শক্তিবিশিষ্ট। (ড) লোক দুঃখ পায়। (ঢ) লোকে অনুতাপ ভোগ করে। (ণ) ছাত্র অধ্যয়ন করে। (ত) সূর্য্য কিরণ দিতেছে। (থ) চন্দ্র কিরণ দিতেছে। (দ) বাতাস বহিতেছে। (ধ) হরি খেলিতেছে। (ন) রাখাল ঘুমাইতেছে। (প) শিক্ষক আসিতেছেন। (ফ) পত্র পড়িতেছে। (ব) পাখী রব করিতেছে। (ভ) পৃথিবী ঘুরিতেছে। (ম) কোন্ ব্যক্তি এরূপ ব্যবহার করে? (য) কে এরূপ সহ্য করিতে পারে? (র) কে এরূপ বলিতে পারে? (ল) কে এরূপ শিক্ষা দিতে পারে। (ব) কে এরূপ সুন্দর রচনা করিতে পারে? (শ) কে এরূপ সুমিষ্ট গান করিতে পারে? (ষ) কে এরূপ আত্মস্বার্থ পরস্বার্থে বলি দিতে পারে? (স) আমার আর কিছুই নাই। (হ) কোন্ ব্যক্তি এরূপ কার্য্য করিতে পারে? (অ) হরি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির বিধেয় সমূহকে সংপ্রসারিত কর।

(ক) সে ঘুমাইতেছে। (খ) সে পড়িতেছে। (গ) তিনি যাইতেছেন। (ঘ) সে মূর্খ। (ঙ) তিনি পণ্ডিত। (চ) তিনি বিদ্বান্। (ছ) তুমি ধার্ম্মিক। (জ) তুমি নিরীহ। (ঝ) তুমি দয়ালু। (ঞ) সকলে নিদ্রা গেল। (ট) সকলে শয্যা পরিত্যাগ করিল। (ঠ) ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে গমন করিল। (ড) তাহারা স্নান করিতে গেল। (ঢ) তাহারা আহার করিতে বসিল। (ণ) সুগন্ধ বহিতে লাগিল। (ত) ধূম নির্গত হইতে লাগিল। (থ) পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। (দ) তিনি শোকে অভিভূত হইলেন। (ধ) তিনি দুঃখে মগ্ন হইলেন। (ন) তিনি অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। (প) তিনি ভৃত্যাকে প্রহার করিলেন।

(ক) তিনি বৃক্ষ ছেদন করিলেন। (ব) আমি গিয়াছিলাম। (ভ) তিনি আসিয়াছিলেন। (ম) আমি যাইব। (য) পত্র পড়ে। (র) নদী উৎপন্ন হয়। (ল) তাপ প্রাপ্ত হই। (ব) আলোক প্রাপ্ত হই। (শ) ধন দাও। (ষ) সকলে নিদ্রা গেলেন। (স) সকলে গৃহ ত্যাগ করিলেন। (হ) রাখালেরা গরু চরাইতে গেল। (অ) ধেনু সকল ফিরিয়া আসিল। (আ) নবপত্রে বৃক্ষ সকল সুশোভিত হয়। (ই) চন্দ্র-কিরণে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ রজতময় বলিয়া বোধ হয়। (ঈ) সে চাহিয়া রহিয়াছে। (উ) পক্ষিগণ উড়িতেছে।

ছেদ প্রকরণ।

১। (,) এই চিহ্নের নাম কমা বা পাদচ্ছেদ। এই চিহ্ন থাকিলে পাঠকালে অত্যল্প কাল বিশ্রাম করিতে হয়।

(ক) বাক্যের মধ্যে উদ্দেশ্য, বিধেয় সম্বন্ধবিশিষ্ট পদ থাকিলে, কমা দ্বারা পৃথক করিতে হয়। যথা,—ইংলণ্ডের রাজা, পঞ্চম জর্জ্জ, আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট।

(খ) একই বিশেষ্য পদের অনেকগুলি বিশেষণ থাকিলে কমা দ্বারা পৃথক করিতে হয়। যথা—দয়ালু, ধার্ম্মিক, ও সত্যবাদী লোকই জগতের অলঙ্কার।

(গ) এক ক্রিয়ার অনেকগুলি কর্ত্তা থাকিলে, কমা দ্বারা তাহাদিগকে পৃথক করিতে হইবে। যথা,—হরি, শ্যাম, রাখাল ও যদু এখানে আসিবে।

(ঘ) সম্বোধন পদের শেষে কমা ব্যবহার করিতে হয়। যথা,—হে ধনিন্, বৃথা তুমি হতেছ গর্ব্বিত।

২। (;) এই চিহ্নের নাম অৰ্দ্ধচ্ছেদ বা সেমিকোলন। এই চিহ্ন থাকিলে পাঠকালে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় বিশ্রাম করিতে হইবে।

(ক) যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত বাক্যাংশগুলি—নতুবা, যেহেতু প্রভৃতি অব্যয় যুক্ত হইলে তাহাদের মধ্যে অৰ্দ্ধচ্ছেদ ব্যবহৃত হইবে;—কদাচ সত্যের প্রতি অনাদর করিবে না; যেহেতু সত্যবাদী অক্ষয় পুণ্য লাভ করেন।

(খ) যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত বাক্যাংশগুলি যখন অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত না হয়। যথা,—দয়ালু ব্যক্তি পৃথিবীর অলঙ্কার; নির্দ্দয় ব্যক্তি পশুর সমান।

(গ) কমা দ্বারা পৃথক করা হইয়াছে এমন যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত বাক্যাংশগুলি পৃথক করিতে হইলে,—যথা,—সত্যবাদী জগতের অলঙ্কার, সমাজের ভূষণ; মিথ্যাবাদী পৃথিবীর কণ্টক, সমাজের অপকারক।

৩। (।) এই চিহ্নের নাম পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি। যেখানে পূর্ব্ব বাক্যের সহিত পরবাক্যের কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেখানে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

৪। (?) এই চিহ্নের নাম প্রশ্নসূচক চিহ্ন। প্রশ্নস্থলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

৫। (!) ইহাকে বিস্ময়সূচক চিহ্ন কহে। বিস্ময়, ভয়, হর্ষ, বিষাদাদি মনের আবেগ প্রকাশ স্থলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

৬। (-) সমাস পদবিভাগ স্থলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ইহাকে সংযোজক চিহ্ন (Hyphen) কহে।

৭। — এক কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ অন্য কথা উপস্থিত হইলে এই চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়। ইহাকে (Dash) ড্যাস্ কহে।

৮। (,—) কোন বিষয়ের উদাহরণ দিতে হইলে এইরূপ চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়।

বাক্যে পদস্থাপন প্রণালী।

১। কর্ত্তার যে পুরুষ ক্রিয়ারও সেই পুরুষ হইবে। যথা,—আমি পড়িতেছি, তুমি পড়িতেছ, সে পড়িতেছে।

২। মধ্যম ও প্রথম পুরুষ এক ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে, মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহৃত হইবে। যথা,—রামও তুমি যাও।

৩। উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষ এক ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াই ব্যবহৃত হইবে। যথা,—রাম তুমি ও আমি যাইব।

৪। উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের হইলে, উদ্দেশ্যের যে পুরুষ ক্রিয়ারও সেই পুরুষ হইবে। যথা,—আমি ক্রমে অলস হইতেছি; তুমি ক্রমে মন্দ হইয়া যাইতেছ।

৫। ক্রিয়া সকর্ম্মক হইলে, কর্ম্মপদ তাহার পূর্ব্বে বসিবে। যদি ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক হয়, মুখ্য কর্ম্মকে ক্রিয়ার পূর্ব্বে এবং গৌণ কর্ম্মকে মুখ্য কর্ম্মের পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হইবে। যথা,—শিক্ষক ছাত্রকে উপদেশ দিতেছেন।

৬। কোন শব্দের উত্তর এক অর্থে দুই প্রত্যয় হয় না। যথা—সুজ-নির ভাব এই অর্থের সৌজন্য পদ হইয়াছে। ইহার উত্তর আবার ভাবার্থে তা প্রত্যয় করিয়া 'সৌজন্যতা' পদ নিষ্পন্ন করিলে ভুল হয়।

৭। বিশেষ্য পদকে বিশেষণ রূপে ও বিশেষণ পদকে বিশেষ্য রূপে প্রয়োগ করা উচিত নহে। আমি আরোগ্য হইয়াছি, তিনি সন্তুষ্ট লাভ করিলেন এরূপ পদ অশুদ্ধ। আমি আরোগ্য লাভ করিয়াছি বা আমি আরোগ হইয়াছি এবং তিনি সন্তুষ্ট হইলেন বা সন্তোষ লাভ করিলেন এইরূপ হইবে।

৮। বহুবচনান্ত একাধিক প্রত্যয়ের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। ছাত্রগণেরা

পুস্তক পাঠ করিতেছে। এখানে 'গণ' ও 'রা' দুইটীই বহুবচনান্ত প্রত্যয়। সুতরাং ছাত্রগণ বা ছাত্রেরা এইরূপ হইবে।

৯। এক বাক্যে দুই নিষেধ বাচক পদ ব্যবহার করিলে বিধিসূচক হয়। যথা—সে এ কার্য্য করিবে না, এমন নয়। অর্থাৎ সে এ কার্য্য করিবে।

১০। কতকগুলি শব্দের সহিত কতকগুলি শব্দের নিত্য সম্বন্ধ আছে। যথা—যদি শব্দের প্রয়োগ করিলে তবে বা তাহা হইলে শব্দের প্রয়োগ করিতে। হয় যথা—যদি তুমি যাও, তাহা হইলে আমি যাইব। যদ্যপি—তথাপি; যথা,—যদ্যপি বিপদ ঘটে, তথাপি একার্য্য করিব। যদিও—তবু; যথা,—যদিও সে করে, তবু তুমি করিও না। বরং—তথাচ; বরং একাকী থাকা ভাল তথাচ কুসংসর্গ ভাল নয়। বরং—তবু;—বরং মরিব তবু মিথ্যাকথা বলিব না। অপেক্ষা বরং মূর্খের সহিত স্বর্গবাস অপেক্ষা বরং পণ্ডিতের সহিত নরকবাসও ভাল। এইরূপ যখন—তখন; যেখানে—সেখানে; যত—তত; যথা—তথা; বটে—কিন্তু প্রভৃতি শব্দের নিত্য সম্বন্ধ আছে।

১১। বিশেষণ শব্দের সহিত সহার্থ পদের সমাস হয় না। 'সবিনয় পূর্ব্বক'; 'সাবধান পূর্ব্বক' ইত্যাদি পদ অশুদ্ধ।

১২। যে স্থলে বহুব্রীহি সমাস করিতে পারা যায়, সে স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া তাহার উত্তর 'আছে' অর্থে কোন প্রত্যয় সংযোগ করা উচিত নয়। যথা নির্ধনী, নিরপরাধী, নির্দ্দোষী, নীরোগী, সুবুদ্ধিমান্, সুকেশিনী, প্রভৃতি পদ অশুদ্ধ। এই সকল স্থলে, নির্ধন, নিরপরাধ, নির্দ্দোষ, নীরোগ, সুবুদ্ধি, সুকেশী, বা সুকেশা প্রভৃতি পদ হইবে।

১৩। এক বাক্যের অন্তর্গত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার এক কর্ত্তৃপদ থাকাই উচিত। যথা—তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি উত্তর দিব।

রচনা সম্বন্ধে সাধারণ উপদেশ।

১। রচনা লিখিবার পূর্ব্বে যে বিষয়ে রচনা লিখিতে হইবে, সে বিষয়টী মনে মনে চিন্তা করিতে হইবে। এবং যে সকল ভাব মনের মধ্যে উদিত হইবে, সেই সকল একটী পৃথক্ কাগজে লিখিতে হইবে। পরে এক একটী ভাব সরল ভাষায় বিস্তৃত করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে।

২। সহজে বুঝা যায় এরূপ ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিবে।

৩। ব্যাকরণের নিয়মগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

৪। যাহাতে বর্ণাশুদ্ধি না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

৫। প্রবন্ধটী অতিশয় দীর্ঘ করিতে চেষ্টা করিবে না। প্রবন্ধের মধ্যে যতদূর সম্ভব সরল বাক্য প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে।

৬। অপ্রচলিত, কঠিন শব্দ ব্যবহার করিবে না।

৭। একই ভাবের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিবে না।

৮। ভাবগুলি পর পর বসাইতে চেষ্টা করিবে। দেখিবে যেন তাহারা কোনরূপ সম্বন্ধ বিহীন না হয়। যাহা পরে লেখা উচিত তাহা পূর্ব্বে লিখিবে না। আবশ্যক মত ছোট ছোট দৃষ্টান্ত দেওয়া কর্ত্তব্য।

৯। কতকগুলি অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা কতকগুলি বাক্যকে একত্র যোগ করা উচিত নহে। এবং, আর, ও প্রভৃতি অব্যয় শব্দ দ্বারা ঐ সকল বাক্য পরস্পর যোগ করিবে।

১০। দুই বাক্যের যোগস্থানে একটী নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং অপরটীকে অত্যন্ত দীর্ঘ করা উচিত নহে।

১১। নীচ কিংবা গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করা উচিত নহে।

১২। প্রবন্ধ রচনার বিষয়গুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটী ভাগে ভাগ

করিয়া, প্রত্যেক ভাগে কি কি ভাব সন্নিবেশ করিতে হইবে, তাহার কয়েকটী আদর্শ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) বস্তুবিষক—বস্তুটী কিরূপ? স্বাভাবিক?—কি কৃত্রিম? স্বাভাবিক হইলে তাহার শ্রেণী, অবস্থান, উপাদান, ব্যবহার। কৃত্রিম হইলে, উদ্ভাবন, উপকরণ, উপাদান, ব্যবহার ইত্যাদি।

(খ) উদ্ভিদ বিষয়ক প্রবন্ধে—জাতি, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, মূল, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প, ফল, বীজ ইত্যাদির বিষয়। উপকারিতা—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও চিকিৎসাদি বিষয়ক। স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ইত্যাদি।

(গ) প্রাণিবিষয়ক প্রবন্ধে—শ্রেণী বিভাগ, অবস্থান, আকৃতি, প্রকৃতি, খাদ্য, গতি, সন্তানাদি, জীবিত কাল ও উপকারাদি।

(ঘ) শিল্পবিষয়ক—আবিষ্কার, প্রক্রিয়া ও উপকারাদি।

(ঙ) দেশ বিষয়ক প্রবন্ধে—সীমা, পরিমাণফল, লোকসংখ্যা, অবস্থান, জলবায়ু, স্বাভাবিকদৃশ্য, অধিবাসী, আচারব্যবহার, উৎপন্ন দ্রব্য কৃষিবাণিজ্য, ঐতিহাসিক ঘটনা।

(চ) জীবন বৃত্তান্ত—জন্মকাল, মাতা পিতা, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, গুণ, সৎকার্য্য, জীবিতকাল, মৃত্যু।

(ছ) গুণবিষয়ক—লক্ষণ, বিকাশ, কার্য্য, উপায়, উদাহরণ।

হস্তী।

হস্তীর দেহ, শুণ্ড, পদ সমস্তই স্থূল ও সুগোল। ইহার কর্ণ অতিশয় বৃহৎ; প্রায় দুই হস্ত দীর্ঘ। ইহার মস্তক গোলাকার। প্রায় অর্দ্ধহস্ত উচ্চ দুইটী মাংসপিণ্ড দুই পার্শ্বে স্থাপিত। উহাদিগকে কুম্ভ কহে। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ বিরল লোমে আবৃত। ইহাদের পুচ্ছ অধিক দীর্ঘ নহে। চতুষ্পদ জন্তুদিগের মধ্যে হস্তীর শরীর অত্যন্ত বৃহৎ। হস্তী প্রায় ৮।৯ হাত

পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি স্থানে ও আফ্রিকায় হস্তী দেখা যায়। ইহারা নিবিড় বনে বাস করিতে ভালবাসে। মনুষ্যেরা কৌশল করিয়া ইহাদিগকে বন মধ্য হইতে ধরিয়া আনে, এবং গৃহপালিত অন্যান্য জন্তুর ন্যায় ইহাদিগকে পালন করে।

হস্তীর শক্তি অসীম। সে ৭০।৮০ মণ দ্রব্য অনায়াসে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। আপন দন্ত দ্বারা ইহারা ২৫।৩০ মণ দ্রব্য অক্লেশে বহন করিতে পারে। হস্তী স্বভাবতঃ ভয়ানক ও হিংস্র নহে। কিন্তু উত্তেজিত করিলে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও উগ্র হয়। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভালবাসে। কোনও স্থানে প্রচুর খাদ্য পাইলে, একাকী আহার না করিয়া আপনার দলের সকলকে আহ্বান করিয়া লইয়া যায়। গমনকালে দুইটী বলবান হস্তী অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিয়া গমন করে। ইহারা বিপদকালে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে।

হস্তী, নদীকূল, উপত্যকা, ছায়াযুক্ত স্থান জলাভূমিতে বাস করিয়া থাকে। ইহাদিগের পিপাসা অত্যন্ত প্রবল। অধিকক্ষণ জলপান করিতে না পাইলে, অতিশয় কষ্ট অনুভব করে। ইহারা মস্তক নামাইতে পারে না বলিয়া শুণ্ড দ্বারা জল গ্রহণ করে এবং ইচ্ছামত পান করিয়া কতকাংশ গাত্রে ছাড়াইয়া দেয়। ইহারা অত্যধিক শীত সহ্য করিতে পারে না।

হস্তিগণ কদলীবৃক্ষ, অশ্বত্থ ও বট প্রভৃতির কোমল শাখা, বৃক্ষপত্র ফল, মূল, শাক শব্জি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে। কিন্তু মৎস্য, মাংস কখনও স্পর্শ করে না। ক্ষেত্রস্থ শস্য পাইলে ইহারা বড়ই আনন্দিত হয়। ইহারা সে সময়ে কতকাংশ ভক্ষণ করে এবং অবশিষ্টাংশ পদদলিত করিয়া বিনষ্ট করিয়া দেয়। হস্তী প্রতিদিন প্রায় ২ মণ ধান্য ভক্ষণ করিতে পারে।

হস্তী সহজেই পোষ মানে। উপকার বা অপকার করিলে ইহারা তাহা বুঝিতে পারে। এবং অত্যন্ত ক্রোধের সময়েও উপকারককে চিনিয়া থাকে। হস্তী পুষিলে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন রক্ষকের প্রয়োজন, তাহাকে মাহুত কহে। হস্তী পোষ মানিলে মাহুতের এতদূর আজ্ঞাবহ হয়, যে মাহুত উহাকে বসিতে বলিলে বসিয়া থাকে, এবং উঠিতে বলিলে উঠে। মাহুতেরা একপ্রকার লৌহনির্ম্মিত অঙ্কুশ ব্যবহার করে। হস্তী অন্যায় আচরণ করিলে মাহুতেরা উহা দ্বারা তাহাকে শাসন করে। হস্তীদের অতিশয় বুদ্ধি ও বল আছে। দূর পথ গমন ও যুদ্ধের কামানাদি দ্রব্য সমূহ বহন করিবার জন্য হস্তী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হস্তীদের দুইটী বৃহৎ দন্ত থাকে; তাহাকে গজদন্ত বলে। এই গজদন্ত দ্বারা মনুষ্য শিল্পকৌশলে নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বহুমূল্যে সে সকল বিক্রয় করিয়া থাকে।

হস্তিনী ১৮ মাস হইতে ২০ মাস পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিয়া একটী শাবক প্রসব করে। হস্তিশাবকেরা ভূমিষ্ঠ হইবার কিছু পরেই উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে এবং মুখদ্বারা স্তন্যদুগ্ধ চুসিয়া পান করে। ইহারা শুণ্ড দ্বারা স্তন্য পান করিবার সময় শুণ্ডটী ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া রাখে। কোনও কোনও হস্তীশাবক স্তন্যপানের সময় শুণ্ড দ্বারা একটী স্তন চাপিয়া রাখে। হস্তিনীর শাবকের প্রতি অতিশয় স্নেহ।

৩৯ বৎসর বয়সের সময় হস্তীর পূর্ণ যৌবন হয়। হস্তিজাতি সন্তরণে অতিশয় পটু। ইহারা ক্রমাগত ২।৩ প্রহর কাল জলমধ্যে সন্তরণ দিয়া থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িতে হইলে ইহারা শুণ্ডটি জলের উপর উত্তোলন করে। হস্তী ১০০ বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকে।

অশ্ব।

চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে অশ্বজাতি দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের পায়ের

ক্ষুর গো, মেষ, মৃগাদির মত খণ্ডিত নহে ইহাদের চক্ষু উজ্জ্বল ও বৃহৎ। কর্ণ হস্তীর ন্যায় দীর্ঘ নহে। লোম অত্যন্ত কোমল এবং গ্রীবাদেশের লোম অত্যন্ত দীর্ঘ। ইহাদের সুদীর্ঘ লোমযুক্ত পুচ্ছ আছে। ইহারা সাধারণতঃ ২।৩ হস্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহাদের বর্ণ নানা প্রকার। স্থানভেদে ইহাদের আকৃতি ও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। গো জাতির ন্যায় অশ্বও মনুষ্যের অনেক উপকারে লাগে।

অশ্বজাতি অতিশয় শ্রমসহিষ্ণু ও বলশালী। উহারা ভার বহনে বিলক্ষণ পটু, দূরপথ শীঘ্র ভ্রমণ করিবার আবশ্যক হইলে, মনুষ্য উহাদিগের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনায়াসে গমন করে; কোনও কোনও দেশের লোক অশ্বদ্বারা হলকর্ষণ করে শকট চালনার্থ উহারা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অশ্বজাতি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। ইহাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া যায় ইহারা সেইরূপ শিক্ষা করিতে পারে। অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়া থাকে। যুদ্ধবাদ্য বাজিয়া উঠিলে ইহারা আরোহি-দিগকে পৃষ্ঠে করিয়া অদম্য উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতে থাকে। যুদ্ধকালে কামানের অতি ভয়ঙ্কর শব্দে ও শত্রুপক্ষের গোলা বর্ষণেও অশ্বগণ ভীত হয় না। অশ্বজাতি অতিশয় প্রভুভক্ত।

অশ্ব শুষ্ক তৃণ ভক্ষণ করিতে ভালবাসিলেও, সরস তৃণও মহানন্দে ভক্ষণ করিয়া থাকে। অনেক অশ্ব কেবল তৃণ ভক্ষণ করিয়াই প্রাণ ধারণ করে। ইহারা বুট, যব, গম প্রভৃতি শস্যও ভক্ষণ করে।

অশ্বের বল অসামান্য। ৫।৬ জন লোক যে বহন করিতে পারে না, তাহারা তাহা একাকী লইয়া যাইতে পারে। ইহারা এরূপ দ্রুতগামী যে ঘণ্টায় ৮।১০ মাইল পথ অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারে। অতিশয় বলিষ্ঠ ও তেজস্বী অশ্ব ঘণ্টায় ২০।২৫ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে। ইহারা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ঘোটকী এগার মাস গর্ভধারণ করিয়া একটীমাত্র সন্তান প্রসব করে। ২০।২২ বৎসর পরে ইহারা পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হয় এবং ৪০।৫০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। ঘোটকীর সন্তানবাৎসল্য অতিশয় প্রবল।

সিংহ।

মূর্ত্তি, কান্তি, বিক্রম, মহত্ব, অধ্যবসায় প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই সিংহ চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এজন্য ইহাকে পশুরাজ বলা হয়। ইহার আকৃতি সৌম্য, গতি মনোহর এবং স্বর ভয়ঙ্কর। পুচ্ছ সহিত সিংহের দৈর্ঘ্য সাধারনতঃ ৪।৫ হাত। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ সিংহ দৈর্ঘ্যে ৭।৮ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র দেহ সিংহ উচ্চতায় দুই হাত এবং বৃহদাকায় সিংহ তিন হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার সর্ব্বাঙ্গে কোমল ক্ষুদ্র লোমে আবৃত। গ্রীবা দেশের লোম অতিশয় দীর্ঘ, ইহাকে কেশর বলে। সিংহী সিংহের ন্যায় বৃহৎ হয় না এবং উহার কেশরও নাই।

সিংহের নখর অতিশয় তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়। ইহারা ইচ্ছামত উহা গুটাইতে ও বাহির করিতে পারে। ইহারা কখনও তৃণ ভক্ষণ করে না। ক্ষুধায় অতিশয় পীড়িত হইলেও অপর প্রাণী কর্ত্তৃক নিহত জীবদেহ ভক্ষণ করে না। ইহার গঠন অতিশয় সবল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন এবং পদতল অতিশয় কোমল বলিয়া গমনকালে ইহার পদশব্দ হয় না। আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের নিবিড় বন সিংহের প্রিয় বাসস্থান।

সিংহ, কেবল মাংস ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং ক্ষুধার্ত্ত হইলেই, ইহারা শিকার অন্বেষণে বহির্গত হয়।

ক্ষুধার্ত্ত হইলে ইহার সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পায় তাহাকেই আক্রমণ করে না। সিংহ গলিত বা দুর্গন্ধযুক্ত মাংস ভক্ষণ করে না। সদ্য বিনষ্ট প্রাণীমাংস এককালে আট দশ সের খাইয়া ফেলে। এবং তৎপরে দুই তিন দিন আহার না পাইলেও কাতর হয় না। ইহারা যতবার আহার

করে, ততবারই নূতন প্রাণী বধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। সিংহের পিপাসা অতিশয় প্রবল। যতবার জল দেখিতে পায় ততবারই লেহন করিয়া পান করে।

সিংহ পরাক্রম, শৌর্য্য বীর্য্য সাহসে অদ্বিতীয়। হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র ও বন্যশূকর ব্যতীত আর কোন প্রাণীই ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না।

সিংহী পাঁচ মাস মাত্র গর্ভ ধারণ করিয়া একেবারে ২।৩টী এবং সময়ে সময়ে ৪।৫টী পর্য্যন্ত শাবক প্রসব করিয়া থাকে। সিংহীর সন্তানবাৎসল্য অতিশয় প্রবল।

ব্যাঘ্র।

ব্যাঘ্র অতিশয় হিংস্র প্রাণী। ইহাদের শরীরের বর্ণ প্রায় কমলালেবুর ন্যায়। মুখ, গলদেশ এবং উদর শ্বেতবর্ণাভ। সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘচিহ্ন-যুক্ত। কিন্তু মুখ ও বক্ষঃস্থলের চিহ্ন বিরল।

ব্যাঘ্র এসিয়া মহাদেশের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সমূহে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয় দ্বীপ সমূহে বাস করিয়া থাকে। মালাবার দ্বীপসমূহ, শ্যাম, বঙ্গদেশ এবং যে যে প্রদেশে হস্তী ও গণ্ডার বাস করে, সেই সেই প্রদেশে ইহার অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বাস করিয়া থাকে। মালাবারে যে প্রকাণ্ডকায় ব্যাঘ্র বাস করে তাহা দৈর্ঘ্যে পুচ্ছ সহিত ১৫ ফিট বা ১০ হস্ত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ব্যাঘ্র, শিকারের প্রতীক্ষায়, গুল্মের অন্তরালে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। এবং শিকার দেখিবামাত্র তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে। সিংহ দুর্ব্বল প্রাণীকে বধ করে না, কিন্তু ব্যাঘ্রের তাহাতে বাধা নাই। সিংহ ক্ষুধার্ত্ত না হইলে কোন প্রাণীকে বধ করে না, কিন্তু ব্যাঘ্র আকণ্ঠ

মাংসভক্ষণ করিলেও শিকার দেখিবামাত্র তাহার প্রাণবধ করিয়া মহানন্দে রক্তপান করে।

ব্যাঘ্রের শরীর সুদীর্ঘ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাতিদীর্ঘ, মস্তক অনাচ্ছাদিত, আকার বিকট এবং চক্ষুদ্বয় কোটরস্থ। ব্যাঘ্র মানুষের বিশেষ কোন উপকারে আসে না, বরং নানা প্রকারে ক্ষতি করে। সময়ে সময়ে ইহাদের এরূপ উগ্র স্বভাব হয়, যে লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া গো, মেষ, মহিষদিগকে বধ করিয়া ফেলে। সিংহ ও ব্যাঘ্রের চর্ম্ম এসিয়ায়, বিশেষতঃ চীনে আদৃত হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রের চর্ব্বিতে ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাদের দন্ত এবং নখও অনেকে ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্যাঘ্রী ও সিংহীর ন্যায় এককালে ৪।৫টী শাবক প্রসব করিয়া তাহাদিগকে অতীব যত্নে লালন পালন করিয়া থাকে। ব্যাঘ্রী স্বভাবতঃই হিংস্র; শাবক বেষ্টিত থাকিলে অধিকতর সিংস্র হইয়া থাকে। শিকারিগণ অত্যন্ত কৌশল করিয়া ব্যাঘ্রশাবক শিকার করিয়া থাকে। একেবারে সমস্ত শাবকগুলি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলে, ব্যাঘ্রী গভীর গর্জ্জন করিতে থাকে। এবং শিকারীরা যে নগরে বা যে জাহাজে আশ্রয় লয়, সেই স্থান পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া শাবকগুলিকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে। এ সময়ে তাহাদের ক্রোধের সীমা থাকে না।

মহিষ।

মহিষ গোজাতি অপেক্ষা বলবান্। ইহারও গরুর ন্যায় ভারবহন, ভূমিকর্ষণ, শকটচালন প্রভৃতি কার্য্যে মানুষের বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। গরুর মত ইহারাও দুগ্ধ দেয়। ইহাদের দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত প্রস্তুত হয়, তাহাকে 'ভয়সা ঘী' বলে।

মহিষ ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাস করে। আমেরিকায় এক প্রকার মহিষ আছে তাহাদিগকে বিষণ্ণ বলে। মহিসের আকার অতিশয় বৃহৎ, কিন্তু শরীরের তুলনায় অধিক উচ্চ নহে। ইহাদের ককুদ নাই। গলকম্বল নাই বলিলেই হয়, বক্ষের নিকট অতি সামান্য পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ। মহিষের শৃঙ্গ অতিশয় দীর্ঘ ও ধারাল।

ইহারা অধিক সংখ্যায় বাস করে না। জলাভূমিই ইহাদের প্রিয় বাসস্থান। ইহারা তৃণ; খড় প্রভৃতি ভক্ষণ করে। মহিষ বৃষ অপেক্ষা অধিক হিংস্র ও সহজে বশীভূত হয় না গৃহপালিত মহিষ সকল অতিশয় নিরীহ ও প্রভুভক্ত। উহারা অনায়াসে পোষ মানিয়া থাকে। রাখালেরা উহাদিগকে প্রহার করিলেও উহারা কখনও তাহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে না। রাখালেরা উহাদিগকে বনমধ্যে চরাইতে লইয়া যায়। তথায় যদি ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি কোনও হিংস্র জন্তু এই রাখালদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সকল মহিষ একত্র হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে। কখন কখন এইরূপ সময়ে দলের মধ্য হইতে দুই তিনটী মহিষ শব্দ করিতে করিতে ঐ হিংস্র জন্তুকে তাড়াইয়া লইয়া যায়।

মহিষের শৃঙ্গে চিরুণি, ছাতার ও ছুরীর বাঁট প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এবং চর্ম্মও মনুষ্যের অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার বিষ্ঠায় ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইহারা দশমাসকাল গর্ভধারণ করিয়া এক একটী শাবক প্রসব করে।

মেষ।

ছাগ ও মেষ এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, মেষের দাড়ি নাই, এবং ইহার শৃঙ্গ প্রথমতঃ পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া, শেষে অল্লাধিক

বক্রভাবে সম্মুখদিকে বিস্তৃত হয়। ইহার কপোল গুম্বজাকার। গো, অশ্ব প্রভৃতির ন্যায় মেষও আমাদের অনেক উপকারে লাগে। ইহাদের মাংস আমরা ভক্ষণ করি। ইহারা আমাদিগকে মূল্যবান চর্ম্ম ও পশম দান করে। মেষের চর্ম্মে পুস্তকের মলাট এবং অন্ত্রে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের তার হইয়া থাকে। ইহার দুগ্ধ গোদুগ্ধ অপেক্ষা ঘন বলিয়া, তাহা হইতে অধিক মাখন পাওয়া যায় ইহার বিষ্ঠায় উৎকৃষ্ট সার হয়।

কেহ কেহ মনে করেন যে, মেষ অতিশয় নির্ব্বোধ, কিন্তু বাস্তবিক ইহারা সেরূপ নহে; ইহারা অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে যেরূপ নিপুণতার সহিত ভ্রমণ করে, তাহা দেখিলে ইহাদিগকে বুদ্ধিহীন বলিয়া বোধ হয় না। গৃহপালিত মেষপাল আক্রান্ত হইলে, অত্যন্ত ভীত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, একথা সত্য। কিন্তু অরণ্য মেষ সেরূপ হয় না। উহারা অসীম অধ্যবসায়ের সহিত আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। ইহাদিগের একটী প্রধান লক্ষণ এই যে, দলের একটী মেষ যেদিকে গমন করে, সকলেই সেইদিকে ধাবিত হয়।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মেষ হইতে যে পশম পাওয়া যায় তাহা অতিশয় অপকৃষ্ট। শীতপ্রধান দেশের মেষের পশম তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মেষের আকারগত পার্থক্যও বিবিধ;—কাহারও পদ দীর্ঘ, কাহারও হ্রস্ব; কাহারও শৃঙ্গ ক্ষুদ্র, কাহারও বৃহৎ, কাহারও বা তাহা নিম্নদিকে বক্র; কাহারও শরীরে পশম নাই, কাহারও পুচ্ছ অতিশয় বৃহৎ।

মেষ ছাগলের ন্যায় প্রধানতঃ তৃণ ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু উদ্ভিজ্জ খাদ্যমাত্রই ইহাদের আহার্য্য গৃহপালিত মেষ, মনুষ্যের খাদ্যও ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু মৎস্য, মাংস স্পর্শ করে না।

গণ্ডার।

গণ্ডার আট হাত দীর্ঘ এবং চারি হস্তেরও অধিক উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার শরীরের বেধ প্রায় দৈর্ঘ্যের সমান। সুতরাং ইহার আকার অতিশয় ভীষণ এবং দেখিতে কুৎসিত। ইহার পৃষ্ঠদেশ হস্তীর ন্যায় ক্রমোচ্চ না হইয়া বরং ক্রমনিম্ন। মস্তক অতিশয় প্রকাণ্ড এবং দীর্ঘ। ওষ্ঠ অত্যন্ত বহির্নির্গত ও নমনীয় বলিয়া একটী ক্ষুদ্র শুণ্ডের কার্য্য করে। কিন্তু ইহার নাসিকার উপরে একটী সূচ্যগ্র, বক্র, অত্যন্ত দৃঢ় এবং নিরেট অংশ আছে, তাহাকে খড়্গ বলে। ইহার জন্যই গণ্ডার সুপ্রসিদ্ধ। এই খড়্গ সময়ে সময়ে দুই হস্ত দীর্ঘ এবং মূলদেশ এক হস্ত বেধবিশিষ্ট থাকে; ইহাই গণ্ডারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় অস্ত্র। ইহার চক্ষু হস্তীর ন্যায় ক্ষুদ্র ও প্রায় অর্দ্ধনিমিলিত; কর্ণদ্বয় অত্যন্ত বৃহৎ। চর্ম্ম অতিশয় দৃঢ় ও স্থূল এবং উপরিভাগ গ্রন্থিময়। ইহার পুচ্ছ অত্যন্ত ক্ষীণ ও কর্কশ এবং ঘন কৃষ্ণবর্ণের লোম দ্বারা আবৃত। উদর কিয়ৎপরিমাণে অবনত। পদচতুষ্টয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলেও অত্যন্ত স্থূল ও বলবান, এবং তিনটী খুর দ্বারা বিভক্ত।

গণ্ডার শান্তিময় অলস জীবন উপভোগ করিয়া থাকে। নদী, হ্রদ ও সমুদ্রের নিকটস্থ তটভূমিই ইহার প্রিয় বাসস্থান। ইহারা প্রায়ই কর্দ্দম বা জলাশয় অথবা কখনও কখনও নদী বা নির্ঝরে পড়িয়া থাকে। ইহাদের গতি অত্যন্ত মৃদু এবং গমনকালে মস্তক নিম্ন করিয়া খড়্গ দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া নির্ভয়ে অরণ্যে প্রবেশ করে।

বঙ্গদেশের তিরাই উপত্যকা, সুন্দরবন ও চট্টগ্রাম, শ্যাম, জাভা এবং আফ্রিকার আবিসিনিয়া ও উত্তমাসা অন্তরীপে ইহাদিগের বাসস্থান।

আফ্রিকার গণ্ডারের সহিত আমাদের গণ্ডারের একবিষয়ে পার্থক্য আছে। উহাদের দুইটী খড়্গ থাকে, কিন্তু আমাদের গণ্ডারের একটীমাত্র আছে।

গণ্ডারী এককালে একটীমাত্র শাবক প্রসব করে। জন্মগ্রহণ কালে ইহাদের খড়্গ থাকে না। দুই বৎসর বয়ঃক্রম কালে উহা এক ইঞ্চি মাত্র দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহারা প্রায় ৭০।৮০ বৎসর প্রাণ-ধারণ করিয়া থাকে। গণ্ডারের শব্দ শূকরের মত। গণ্ডারের শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল। কিন্তু ইহাদের দর্শন ও স্পর্শশক্তি অতিশয় অল্প। ইহাদের চর্ম্মে সুদৃঢ় ঢাল নির্ম্মিত হয়। শাক শবজি, কাঁটাগাছ খাইয়া গণ্ডার জীবনধারণ করে। শস্য পাইলে ইহাদের অপার আনন্দ জন্মে। তখন ইহারা হস্তীর ন্যায় তথায় গমন করিয়া বিস্তর ক্ষতি করে।

নারিকেল বৃক্ষ।

নারিকেল বৃক্ষ আমাদিগের বিশেষ উপকারী। ইহার সমস্ত অংশই আমাদের কোন না কোন প্রয়োজনে লাগে। ইহার আকার দীর্ঘ এবং অগ্রভাগে শাখা ও ফল জন্মে। শাখার দুই পার্শ্বে লম্বা পত্র উৎপন্ন হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ৬০।৭০ হাত পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। ইহার এক এক কাঁদিতে অনেক নারিকেল জন্মে। মুচিগুলি যত বড় হইতে থাকে ততই উহার মধ্যে জল জমে। শেষে সেই জল ক্রমে শুকাইয়া শাঁস হইয়া উঠে।

এই বৃক্ষ প্রায়ই লোণা দেশে জন্মিয়া থাকে। যে দেশের জল লোণা নহে, সেখানে ইহা রোপণ করিলে অধিক বাড়ে না। ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নারিকেল জন্মে।

সিংহল ও পূর্ব্ব উপদ্বীপের অনেক স্থানে প্রচুর নারিকেল বৃক্ষ দেখা যায়। পশ্চিম বঙ্গদেশের মধ্যে গঙ্গা, রূপনারায়ণ, দামোদর প্রভৃতি বড় বড় নদীর তীরস্থ ভূভাগে বিস্তর নারিকেল জন্মে। পূর্ব্ববাঙ্গালায় নদ নদীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া, সেইখানেই প্রচুর নারিকেল গাছ দেখা যায়। নারিকেল উৎকৃষ্ট খাদ্য। উহার শাঁস অতি পুষ্টিকর। নারিকেলের মুচি বড় হইলে তাহাকে আমরা ডাব বলি। আর পরিণত হইলে তাহাকে ঝুনা বলি। ডাব ও ঝুনা উভয়ই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্ব-বাঙ্গালা অঞ্চলে দোয়ালা বা ফুর্ম্মো নারিকেল হইতে জিরাচিড়া প্রস্তুত হয়। ঝুনা নারিকেলের শাঁসে সন্দেশ ছাপা, চন্দ্রপুলী প্রভৃতি মিষ্টান্ন ও তৈল প্রস্তুত হয়। নারিকেলখণ্ড ঔষধও ইহা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ফোঁপল সুখাদ্য বলিয়া লোকে ভক্ষণ করে। ইহার খোলে হুঁকা প্রস্তুত হয়। হিন্দুরা নারিকেলের খোলকে পবিত্র জ্ঞান করেন। বৈষ্ণবেরা ও অন্যান্য গরিব লোকে নারিকেলের খোল পাত্ররূপে ব্যবহার করে।

নারিকেল বিলক্ষণ লাভজনক। ইহার ছোবড়ায় দড়ি কাছি, গদি, পাপোষ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। শুষ্ক পত্র ও চুমরী বেশ জ্বলে। ইহার দীর্ঘ গুঁড়ি বাসগৃহের খুঁটিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাতার শিরগুলি দিয়া ঝাঁটা প্রস্তুত হয়।

নারিকেলের বৃক্ষ আট দশ বৎসরে ফলবান্ হয়। এবং প্রায় এক শত বৎসর বাঁচিয়া থাকে। পূর্ব্ব-বাঙ্গালার অনেক স্থলে এক একটী নারিকেল বাগান দ্বারাই এক একটী বড় বড় সংসারের খরচ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়।

বাঁশ।

বাঁশ আমাদিগের বিশেষ উপকারী। পল্লীগ্রাম বাসীদিগের ইহা

একটী প্রধান সম্পত্তি। বাঁশ একস্থানে অনেক জন্মে। এক এক ঝাড়ে প্রায় দুই শত বাঁশ জন্মিয়া থাকে। ইহার সাধারণতঃ প্রায় ৩০।৪০ হাত লম্বা হয়। ইহার আকার দীর্ঘ এবং ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়। ইহার সর্ব্বাঙ্গে প্রায় এক হাত অন্তর গ্রন্থি থাকে। এই সকল গ্রন্থি হইতে সরু সরু শাখা বাহির হয়, উহাকে কঞ্চি বলে। কঞ্চির গাত্রে বাঁশের পত্র সকল জন্মে। দেশভেদে সরু, মোটা নানাপ্রকার বাঁশ জন্মে।

আমাদের দেশে ভাল্কো বাঁশনী, তলদা, বেউড় প্রভৃতি বাঁশ প্রধান। যে সকল বাঁশের গ্রন্থি অতি নিকটে নিকটে জন্মে, তাহারা অত্যন্ত পুরু ও শক্ত হয়। আর যাহাদের গ্রন্থি দূরে দূরে জন্মে তাহারা পাতলা ও অল্পদিন স্থায়ী হয়। বাঁশের মধ্যে ভাল্কো সর্ব্বাপেক্ষা পুরু ও শক্ত। তলদা সর্ব্বাপেক্ষা পাতলা ও অসক্ত। পরিপক্ক বাঁশ কিছুদিন জলে ফেলিয়া রাখিয়া, তারপর কোন কার্য্যে ব্যবহার করিলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এবং ঘুণ প্রভৃতি কীটে তাহা নষ্ট করিতে পারে না। বাঁশনী বাঁশে অতি সরু সরু শলাকা প্রস্তুত হয়।

একটী বাঁশের মূল রোপণ করিলে, সময়ে তাহা হইতেই একটী ঝাড়ের সৃষ্টি হয়। খাল, বিল ও নদীর তীরে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মিয়া থাকে। পুরাতন পুষ্করিণীর পাঁক অথবা অন্য কোন প্রকার সার বাঁশের গোড়ায় দিলে শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে।

ভারতবর্ষ ও পূর্ব্ব-উপদ্বীপের অনেক স্থানে অপর্য্যাপ্ত বাঁশ জন্মে। পল্লীগ্রামে অনেক গৃহ বাঁশের দ্বারাই নির্ম্মিত হয়। বাঁশের দ্বারা পল্লীগ্রামবাসীরা নদীর উপর সুন্দর সেতু প্রস্তুত করিয়া থাকেন। কুলো, ধুচুনি, চুবড়ি, ঝুড়ি প্রভৃতি গৃহসামগ্রী ও বিবিধ বস্তু বাঁশের দ্বারা

নির্ম্মিত হয়। চীন ও বর্ম্মায় যে বাঁশ জন্মে, তাহাদ্বারা তদ্দেশবাসীরা নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করে। শুষ্ক বংশ ইন্ধনরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাগজ।

কাগজ কোন সময়ে আমাদের দেশে প্রথম প্রচলিত হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রথমে চীনদেশে আবিষ্কার হয়। চীনদেশের কাগজ ও তুলট আমাদের দেশে অনেকদিন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। পরে ইউরোপ হইতে এদেশে কাগজ লাগিল এবং এদেশেও প্রস্তুত হইতে লাগিল সুতরাং চীন দেশের কাগজও তুলটের ব্যবহার কমিয়া আসিল। পূর্ব্বে আমাদের দেশে শ্রীরামপুরের কাগজ প্রস্তুত হইত। এক্ষণে বালী ও টিটেগড় কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী অতি সহজ। ছিন্নবস্ত্র, খড়, পাট, শণ প্রভৃতি পদার্থ কাগজের প্রধান উপাদান। ছিন্নবস্ত্র উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ঢেঁকিতে কুটিতে হয়। পরে উহার সহিত একটু জল দিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া ঐ মণ্ড ঈষদুষ্ণ জলে গুলিতে হয়। এবং বাঁশ বা লৌহশলাকার ছাঁকনি ঐ জলে ডুবাইয়া কিছুক্ষণ ঊর্দ্ধে ধরিয়া রাখিলে, ঐ দ্রবপদার্থ উহার উপরে সরের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এবং ছাঁকনির ছিদ্র দিয়া সমস্ত জল পড়িয়া যায়। পরে একটী পরিষ্কার, মসৃণ তক্তার উপর উহা উল্টাইয়া ঝাড়িলে, ছাকনীর আকারের কাগজ প্রস্তুত হয়।

এইরূপে অনেকগুলী কাগজ উপর্য্যুপরি রাখিয়া চাপ দিলে, জলভাগ নিঃশেষিত হইয়া বাহির হইয়া যায়। তখন ঐ কাগজগুলি পৃথক পৃথক করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া পরে উহাতে ভাত ও আলুর মাড় দিয়া পুনরায়

শুকাইলে শক্ত হয়। পরিশেষে ঐ গুলির চারিধার সমান করিয়া কাটি দিয়া দিস্তা বাঁধিতে হয়। বিলাতী কাগজের ২৪ তায় এক দিস্তা ও ২০ দিস্তায় এক রীম। দেশী কাগজের ২৫ তায় ১ দিস্তা হয়।

তেঁতুলের বীজের সারভাগ মণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া পীত বা লোহিত বর্ণ মিশাইলে তুলট কাগজ প্রস্তুত হয়। কীটে নষ্ট করিবার ভয়ে উহাতে একটু হরিতাল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। আমরা নানা বর্ণের কাগজ দেখিতে পাই। উহাদের নির্ম্মাণ প্রণালী অতীব সহজ। জলে মণ্ড গুলিবার সময় তাহাতে যে রঙ্ মিশ্রিত করা যায়, কাগজেরও সেই বর্ণ হয়।

আমাদের দেশে লোকে প্রথমে বট,অশ্বত্থ, কদলী, তাল প্রভৃতি বৃক্ষের পত্রে লিখিতেন। অদ্যপি আমাদের দেশীয়পাঠশালার বালকগণ কদলী ও তালপত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। বৃক্ষপত্রের পর বৃক্ষের বল্কলে লিখন কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। আমাদের দেশে ভূর্জপত্রেরই অধিক ব্যবহার ছিল। ধাতু ও প্রস্তরফলকে অনেক লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উহা আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মেষও ছাগলের পরিষ্কৃত চর্ম্মে একপ্রকার কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। উহাকে ইংরাজিতে পার্চমেণ্ট বলে। উহা অত্যন্ত শক্ত ও বহুকালস্থায়ী।

কাগজের প্রচলন হওয়াতে শিক্ষার অশেষ কল্যাণ হইয়াছে। পূর্ব্বে হস্তলিখিত পুঁথি প্রস্তুত করা বহুশ্রমসাধ্য ছিল। এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্র ও কাগজের সাহায্যে পুস্তক প্রচলন অতি সহজসাধ্য হইয়াছে। দীনদরিদ্র ব্যক্তিগণও অল্প আয়াসে ও অল্প ব্যয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারিতেছেন। বস্তুতঃ কাগজ যে আমাদের সভ্যতা বিস্তারের প্রধান সহায়, সেবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

কাচ।

বালি ও এক প্রকার ক্ষার মিশ্রিত করিয়া অত্যন্ত অগ্নির উত্তাপ দিলে গলিয়া যায়। ঐ দ্রবীভূত পদার্থ শীতল হইলেই কাচ হয়। কাচ আমাদের অনেক উপকারে লাগে। ইহার ব্যবহারও আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে। শিশি, বোতল, গ্লাস, বাটী, ঝাড়, লণ্ঠন, সারসী ও বিবিধ দ্রব্য কাচ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমরা নানাবর্ণের কাচ দেখিতে পাই। অগ্নির উত্তাপে কাচ যখন গলিয়া যায়, সেই অবস্থায় যে বর্ণ ইচ্ছা মিশ্রিত করিলে কাচেরও সেই বর্ণ হয়। গলিত অবস্থায় কাচকে ইচ্ছামত যে কোন আকারে পরিণত করা যায়। পরে শীতল হইলে কঠিন হইয়া উঠে।

কাচ হইতে আরসি প্রস্তুত হয়। পারা ও রাঙ্ এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া কাচের এক পৃষ্ঠে লেপিয়া দিলে, অপর পৃষ্ঠে সকল বস্তুর সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়ে। যতদিন পর্য্যন্ত পারা ও রাঙের লেপ উঠিয়া না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রতিবিম্ব ঠিক পড়ে। আর লেপ উঠিয়া গেলে, আর তাহাতে আকৃতি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না।

কাচ সর্ব্বদাই মসৃণ ও উজ্জ্বল থাকে। ইহা অতিশয় স্বচ্ছ পদার্থ। ইহার মধ্য দিয়া আলোক আসিতে পারে। কাঁসা, পিতল প্রভৃতি দ্রব্যে যেরূপ তৈলাক্ত কোন দ্রব্য রাখিলে বিকৃত হয়, কাচপাত্রে সেরূপ হয় না। সেজন্য সভ্য জাতির মধ্যে অনেকেই কাচপাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ। অল্প আঘাতেই ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। একবার ভাঙ্গিলে আর ইহার উত্তমরূপে সংস্কার করা যায় না। যদিও সম্প্রতি কাচ ভাঙ্গিয়া গেলে সংস্কার করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সংস্কার অধিক দিন স্থায়ী হয় না।

একখানি কাচখণ্ডের একপ্রান্তে অগ্নিসংযোগ করিয়া অপর প্রান্ত

ধরিয়া রাখিলে তাহাতে অগ্নির উত্তাপ বোধ হয় না। কাচে তাপ এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পরিচালিত হইতে পারে না বলিয়া উহাকে অপরিচালক বলে। কাচ ভঙ্গপ্রবণ বটে কিন্তু তথাপি, হীরক ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে ইহাকে ইচ্ছামত কাটিতে পারা যায় না। হীরকের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ দিয়া কাচের উপর টানিয়া গেলে একটা দাগ পড়ে, পরে দুই ধারে অল্প জোর দিলেই ঐ দাগের স্থান দিয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

গ্রীষ্মকাল।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল। এই কালে সূর্য্যের কিরণ অতিশয় প্রখর হয়। দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিমান অল্প হয়। এজন্য রাত্রিকালে ভূমি সম্পূর্ণ শীতল না হইতে হইতেই পুনর্ব্বার সূর্য্যের তাপ গ্রহণ করে। ইহাতে দিন দিন তাপ বৃদ্ধি পায়। আকাশ সাধারণতঃ পরিষ্কৃত অথবা বিচিত্র বর্ণের মেঘবিশিষ্ট থাকে। সূর্য্যের প্রখর কিরণে মাঠ ঘাট সকল শুষ্ক হয়। ক্ষেত্র সকল বিদীর্ণ হইয়া যায়। জীবজন্তু পিপাসায় আকুল হইয়া পড়ে। বায়ু এতদূর শুষ্ক হয়, যে অঙ্গে লাগিলে যেন দগ্ধ হইয়া গেল বলিয়া বোধ হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে দারুণ আলস্য উপস্থিত হয়। কেবল ঘুমাইতে ইচ্ছা করে। মরুভূমির অবস্থা অতীব ভীষণ হয়। তৃষ্ণাতুর পথিকগণ জলভ্রমে মরীচিকায় জীবন হারায়। এইকালে দক্ষিণ দিক হইতে মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হয়। এবং মধ্যে মধ্যে উত্তরপশ্চিম কোণে মেঘ সঞ্চিত হইয়া ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া থাকে। কোন কোন বৎসর বৈশাখ মাসের শেষে প্রতিদিন বৈকালে এইরূপ ঝড় ও বৃষ্টি হয়। ইহাকে কালবৈশাখী বলে। এইকালে প্রভাত ও সন্ধ্যা সময়ে, নদীতীরে ও উদ্যানে ভ্রমণ ও মৃদুমন্দ অপেক্ষাকৃত শীতল

বায়ু সেবন অতীব সুখদ বলিয়া বোধ হয়। গ্রীষ্মের প্রকোপে রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। অধিকাংশ রাত্রিতে লোকের সুনিদ্রা হয় না। মশা ও মাছির উপদ্রব এইকালে অতিশয় বৃদ্ধি পায়। জলাশয়ের জল প্রখর রবির কিরণে শুষ্ক হইতে থাকে। কিন্তু পর্ব্বতোপরি সঞ্চিত তুষার সকল বিগলিত হওয়ায়, নদীর জলের হ্রাসবৃদ্ধি অনুভূত হয় না। এইকালে ভূমি আর্দ্র থাকিতে পারে না বলিয়া, বঙ্গদেশে ম্যালিরিয়ার প্রকোপ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই সময়ে আম, জাম, কাঁটাল, লিচু, প্রভৃতি বিবিধ সুখাদ্য ফল পাকিয়া উঠে। আশু ও হৈমন্তিক ধান্যের কোমল দেহে, দক্ষিণ বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হওয়ায়, ধান্য ক্ষেত্রের দৃশ্য অতীব সুন্দর ও মনোরম হইয়া উঠে। রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, টগর, চম্পক, বেল, যুঁই প্রভৃতি অনেক সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করে।

বর্ষাকাল।

আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল। এইকালে আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এই ঋতুতে সর্ব্বদাই দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক হইতে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়। মধ্যে মধ্যে গভীর মেঘগর্জ্জন এবং বজ্র ও বিদ্যুৎ সহিত ভীষণ ঝটিকা উপস্থিত হইয়া থাকে। অবিরত বৃষ্টিপাত ও ঝটিকার আঘাতে অনেক গৃহ ও বৃক্ষাদির পতন হয়। বর্ষাকালে নদনদী ও সরোবরাদি জলে পরিপূর্ণ হয়। বাঙ্গালার সমতল ভূমি এবং বেহার ও আসামের নদীর নিকটস্থ সমুদায় নিম্নস্থান জলমগ্ন হইয়া যায়। ভূমি জলসিক্ত হইয়া কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত হয়। সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিজ্জ সতেজ হইয়া উঠে এবং শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। নদীর জল বর্দ্ধিত হওয়ায়, তীর প্লাবিত করিয়া

চলিয়া যায়। প্লাবন অধিক হইলে নদীতীরস্থ শস্যাদি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। অল্প প্লাবন হইলে তদ্দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে নানাপ্রকার বৃক্ষলতাদি পচিতে থাকে, সেইজন্য বর্ষার শেষে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। পথঘাট কর্দ্দমময় থাকে বলিয়া পথে চলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। নূতন জল পাইয়া ভেকদলের অত্যন্ত আনন্দ হয়। জলৌকা, শম্বুক প্রভৃতির উৎপাত এই সময়ে বৃদ্ধি পায়। কেতকী, কদম্ব, কুমুদ, কহলার প্রভৃতি পুষ্প জল ও স্থল সুশোভিত করে। আনারস, পেয়ারা প্রভৃতি ফল এ সময়ে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে।

শরৎকাল।

ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাস শরৎ কাল। এই কালে আকাশ প্রায়ই মেঘশূন্য ও নির্ম্মল থাকে, কখন কখন শ্বেতবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হয়। বর্ষাকালের ন্যায় এ সময়ে বর্ষণ বা বজ্রপাত থাকে না। মধ্যে মধ্যে গগনে রামধনুর বিচিত্র শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন মেঘের গম্ভীর গর্জ্জনও শুনিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে গ্রীষ্মের প্রতাপ থাকে না অথচ শীতের প্রকোপ উপস্থিত হয় না; এই জন্য শরৎ আমাদের দেশে পরম রমণীয় ঋতু। পথ, মাঠ, ঘাট আর কর্দ্দমাক্ত থাকে না। চতুর্দ্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়। শরতের মেঘযুক্ত আকাশে সূর্য্যের কিরণ যেন দিন দিন প্রখর হইতেছে বলিয়া অনুভূত হয়। রাত্রিকালে বিমল চন্দ্রের কিরণ ধরাতলে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা উৎপাদন করে। নদ, নদী ও পুষ্করিণীর জল সুনির্ম্মল হয়। নদীস্রোত এ সময়ে প্রবল থাকে না। এই সময়ে ক্ষেত্রের শোভা অতিশয় মনোহর হয়। হরিদ্বর্ণ শস্য সকল মৃদু মন্দ বায়ুভরে আন্দোলিত

হইয়া কৃষকের অপার আনন্দ উৎপাদন করে। উদ্যানে স্থলপদ্ম ও মাঠে শ্বেতবর্ণ কাশপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া অতুল শোভা বিস্তার করে। জলাশয়ে রক্ত ও শ্বেতপদ্ম সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধে ও সৌন্দর্য্যে সকলকে মুগ্ধ করে। আকাশে বকসকল শ্রেণী বদ্ধ হইয়া মালার আকারে উড়িতে থাকে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন শূন্যে শ্বেতপুষ্পের সুদীর্ঘ মাল্য ঝুলিতেছে। এইকালে বক, ভূচম্পক, শেফালিকা প্রভৃতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিক সুগন্ধে আমোদিত করে।

হেমন্তকাল।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস হেমন্ত কাল। এই কালে উত্তরদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। সন্ধ্যার সময় হইতে হিম পড়িতে আরম্ভ করে। সমস্ত রাত্রি পৃথিবী যেন ধূমে আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়। যতদিন যায়, ততই ক্রমশঃ ঈষৎ শীতের অনুভব হয়। এই সময়ে হিম ভোগ করিলে কফ, কাসী, জ্বর প্রভৃতি রোগ জন্মে। এই জন্য লোকে শীতবস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে হৈমন্তিক ধান্য পাকিয়া উঠে। কৃষকদিগকে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে হয়। তাহারা সমস্ত দিনই ক্ষেত্রে ধান্য কাটিতে ব্যস্ত থাকে। এবং সেই সকল ধান্য আটি বাঁধিয়া আনিয়া বাটীর উঠানে রাশীকৃত করিয়া রাখে। পরে সেই আটিগুলি আছড়াইয়া খড় হইতে ধান্য পৃথক করে। এই সময়ে কৃষকেরা ইক্ষুর চাস করিতে আরম্ভ করে। তাহারা আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে ভূমি হলদ্বারা কর্ষণ করিয়া মই দিয়া মৃত্তিকা সমতল করে। পরে এই ক্ষেত্রে সার নিক্ষেপ করিয়া ছোলা, মুগ, মসূর প্রভৃতি কলাইয়ের বীজ ও যব, সরিষা ও তিসীর বীজ বপন করিয়া থাকে। এই সকল হৈমন্তিক শস্য দ্বারা নানা দেশের লোক প্রতিপালিত হয়। হেমন্তের প্রথমযোগে

প্রায় প্রতি বৎসরই কয়েক দিন ক্রমাগত বৃষ্টি হয়। এতদ্ভিন্ন এই ঋতুতে প্রায় ঝড় বৃষ্টি হয় না।

শীতকাল।

পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীতকাল। এই কালে উত্তরদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। শীতকালের রাত্রি বড় ও দিবা অল্প হয়। এই সময়ে বৃক্ষের পত্র সকল নীরস ও শুষ্ক হইয়া পড়িয়া যায়। প্রকৃতি যেন এক বিরস ও রুক্ষ ভাব ধারণ করেন। শীত কালের প্রাতঃকালে প্রায়ই সমস্ত পৃথিবী কুয়াসায় আচ্ছন্ন থাকে। রাত্রে অতিশয় হিম পড়ে। শীতপ্রধান দেশে প্রচুর পরিমাণে তুষারপাত হয় এবং অনেক নদ নদীও ও জলাশয়ের জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। এ সময়ে শীতের প্রকোপে লোকে সর্ব্বদা শীত বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকিয়া রাখে। এই কালে সূর্য্যের কিরণ যেন তীক্ষ্ণ বলিয়া বোধ হয় না। কৃষকেরা এই সময়ে বোরো ধান্যের চাষ আরম্ভ করে। চতুর্দ্দিকেই লোক নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। কৃষকেরা শস্যক্ষেত্রে, কাষ্ঠসংগ্রহকারীরা বনে, বণিকগণ পণ্যদ্রব্য লইয়া দেশ দেশান্তর গমনে ব্যস্ত থাকে। এই সময়ে কুল, দাড়িম, পেস্তা, কমলা লেবু প্রভৃতি দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। আম্রবৃক্ষসকল মুকুলিত হয় এবং চতুর্দ্দিকে সুগন্ধে আমোদিত করে।

বসন্ত কাল।

ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস বসন্ত কাল। এই কালে দক্ষিণ দিক হইতে মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হয়। এই ঋতুতে আকাশ সাধারণতঃ পরিষ্কৃত অথবা বিচিত্র বর্ণের মেঘবিশিষ্ট থাকে। কখন কখন উত্তরপশ্চিম কোণে মেঘ সঞ্চিত হইয়া ঝড় ও বৃষ্টি হয়। বসন্তকালের মধ্যযোগে অর্থাৎ

১০ই চৈত্র তারিখে সূর্য্য ঠিক পূর্ব্ব দিক হইতে উদিত, পশ্চিম দিকে অস্তগত হয়। এবং দিবারাত্র সমান অর্থাৎ প্রত্যেকে ১২ ঘণ্টা বা ৩০ দণ্ড হইয়া থাকে। সেই তারিখ হইতে গ্রীষ্মের শেষ দিন পর্য্যন্ত সূর্য্য ক্রমে কিছু কিছু করিয়া উত্তর দিকে সরিয়া উদিত ও অস্তগত হয়। এইজন্য রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। এই কালে বর্ষার অবিরল বারিধারা, বিদ্যুতের লীলা, বজ্রের ধ্বনি, গ্রীষ্মের প্রকোপ কিংবা শীতের তীক্ষ্ণতা কিছুই থাকে না। এইজন্য এই ঋতু অন্য সকল ঋতু অপেক্ষা অধিক মনোরম। ক্ষেত্র সমূহ নবদূর্ব্বাদলে সুশোভিত এবং বৃক্ষ লতাদি পল্লবিত ও মুকুলিত হয়। বেল, যুঁই, চম্পক, গোলাপ, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করে। ধরণী এক নবীন মাধুরী ধারণ করেন। পরিষ্কৃত ময়দানে হরিণ শিশুর উল্লম্ফন, প্রাণিগণের আনন্দে বিচরণ, দর্শন করিলে এবং বৃক্ষশাখায় পক্ষিগণের সুমধুর কূজন শ্রবণ করিলে মনে হয় জীবজন্তুর প্রাণে কতই উল্লাস উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বোধ হয় পণ্ডিতগণ বসন্তকে ঋতুরাজ বলিয়াছেন। কোকিলের সুমধুর কণ্ঠস্বর এই কালেই শুনিতে পাওয়া যায়; অন্য সময়ে প্রায়ই শ্রুত হয় না। এইজন্য কোকিলকে দূত বা বসন্তের সহচর বলা হয়। এই কালে জীবমাত্রেরই শরীর সুন্দর ও হৃদয় প্রফুল্ল হয়। কিন্তু কখন কখন বসন্ত ও ওলাউঠা প্রভৃতি রোগের আবির্ভাব হেতু মারিভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। কৃষকেরা ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে প্রথম বৃষ্টি হইলে সকল ভূমিতেই দুইবার হল কর্ষণ করিয়া সার নিক্ষেপ করে। এই কর্ষিত মৃত্তিকা সূর্যের প্রখর কিরণে উত্তপ্ত হইয়া অধিক উর্ব্বরা হইয়া থাকে। ভূমি হল দ্বারা উত্তমরূপে কর্ষিত না হইলে, শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে না। এই হেতু কৃষকেরা চৈত্রমাসের মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্যের দারুণ উত্তাপ সহ্য করিয়াও যত্নপূর্ব্বক হলকর্ষণ করিতে

আলস্য করে না। এইকালে গোধুম, যব, তিসী প্রভৃতি পরিপক্ক হয়। কৃষকেরা অরহর ও ইক্ষুর মূলদেশ ছেদন করিয়া গৃহে লইয়া যায়।

রেলগাড়ী।

রেলগাড়ী চড়িয়া আমরা অতি অল্প সময়েই অনেক পথ যাইতে পারি। কখন কখন রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৬০ মাইল, অর্থাৎ প্রায় তিন দিনের রাস্তা যাইয়া থাকে। একখানি ট্রেণে অনেকগুলি গাড়ী থাকে। গাড়ীর উপরিভাগ কাষ্ঠ অথবা লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত। উহার নিম্নভাগে লৌহের চাকা আছে। যে সকল গাড়ীতে আরোহীরা যাতায়াত করে, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ আছে। কক্ষে বসিবার জন্য বেঞ্চ দেওয়া থাকে। রাত্রিতে এই সকল গাড়ীতে আলোক দেওয়া হয়।

ট্রেণের প্রথম গাড়ী খানিকে এঞ্জিন বলে। এই এঞ্জিনই সমস্ত গাড়ীগুলিকে টানিয়া লইয়া যায়। এঞ্জিনে একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড থাকে। উহার উপর জল ফুটাইবার একটী পাত্র থাকে, তাহার নাম বয়লার। বয়লারে জল ফুটিয়া যে বাষ্প হয়, তাহার জোরে এঞ্জিনের চাকা ঘোরে। রেলের রাস্তার উপর দুইখানি দীর্ঘ লৌহ পাশাপাশি বসান থাকে। এই লৌহকে রেল বলে এবং ইহা হইতেই রেলওয়ে নামাইয়াছে। রেলগাড়ী এত ভারী যে রেল না থাকিলে চাকা মাটীতে বসিয়া যাইত। রেলের উপরদিয়া অতি সহজেই চাকা চলিতে পারে।

রেলপথে কতগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাড়ী থামে। ইহাদিগকে ষ্টেশন বলে। প্রত্যেক ষ্টেশনে যাত্রীরা উঠিতে ও নামিতে পারে। রেলগাড়ী যখন চলে, তখন গাড়ীতে উঠিতে যাওয়া বা গাড়ী হইতে নামিতে চেষ্টা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ভাড়া না দিলে রেলগাড়ীতে যাইতে পারা যায় না।

রেলগাড়ীর সাহায্যে অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে দূর দেশে যাতায়াত করিতে পারা যায়। রেলওয়ে হওয়াতে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের বিস্তর সুবিধা হইয়াছে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে অনেক সময়ে এরূপ ঘটিত যে, এক প্রদেশে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে, অথচ আর এক প্রদেশে অন্নাভাবে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তখন জানিতে পারিলেও এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে, চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য পাঠান অসম্ভব হইত। বর্ত্তমান সময়ে রেলগাড়ীর সাহায্যে দুই চারি দিনের মধ্যেই এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে সহস্র সহস্র মণ শস্য অনায়াসে আনিতে পারা যায়। রেলওয়ে হওয়ায় দুর্ভিক্ষ নিবারণের পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়াছে।

মুদ্রা।

ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধার জন্য মুদ্রা নিতান্ত আবশ্যক। মুদ্রা না হইলে আমাদের একদিনও চলে না। চাউল, দুগ্ধ, বস্ত্র, পুস্তক যে কোন দ্রব্যই বলনা কেন, মুদ্রা হইলে আমরা সমস্তই ক্রয় করিতে পারি।

পূর্ব্বকালে এমন এক সময় ছিল, যখন দেশে মুদ্রার ব্যবহার ছিল না। তখন লোকে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া ও বন্য পশু শিকার করিয়া জীবনধারণ করিত। ক্রমে যখন মানুষ সভ্য হইতে লাগিল, তখন পরস্পরের মধ্যে দ্রব্যাদি বিনিময় করিতে পারিলেই যে সকলের সুবিধা হয়, তাহা বুঝিতে পারিল। এইরূপ বিনিময় প্রথা অনেকদিন প্রচলিত ছিল। এখনও এ প্রথা একেবারে লোপ পায় নাই। কিন্তু এরূপ প্রথায় লোকে বহু কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও অনেক সময়ে নিজের যাহা নিতান্ত প্রয়োজন, সেরূপ দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে না। মুদ্রা না থাকিলে ক্রয় বিক্রয় কখনই সম্ভবপর হইত না। ব্যবসায়ীরা মুদ্রাদ্বারা নানাবিধ দ্রব্য ক্রয়

করিয়া রাখে। পরে সুবিধা অনুসারে মুদ্রা লইয়া দ্রব্য সকল বিক্রয় করিয়া থাকে।

ধাতুদ্বারা মুদ্রা নির্ম্মিত হয়। কোন কোন দেশে টাকা পয়সার পরিবর্ত্তে কড়ির ব্যবহার আছে। সুতরাং কড়িকেও একপ্রকার মুদ্রা বলা যায়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে কড়ির ব্যবহার ছিল। কিন্তু সভ্য দেশ সমূহে মূল্যবান ধাতু হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর মূল্য এত অধিক যে, সামান্য একখণ্ড স্বর্ণ বা রৌপ্যের মূল্যে অনেক অধিক পরিমাণে আমাদের নিজ ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারা যায়। মুদ্রা মূল্যবান্ ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া, প্রচুর অর্থ অনায়াসে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইতে পারা যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য, নিকেল, কাঁসা ও তামা এই সকল ধাতু দ্বারা সচারচার মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধাতুর মূল্য অনুসারে মুদ্রার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, সকল দেশের মুদ্রা একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রার ব্যবহার আছে। আমাদের দেশে সভারেন, টাকা, আধুলী, সিকি, দুয়ানী, পয়সা এই সকল মুদ্রা প্রচলিত।

সংসার নির্ব্বাহের জন্য আমাদিগের সকলকেই অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, কিন্তু অর্থ উপার্জ্জন অপেক্ষা ইহার সদ্ব্যয় কঠিন। অনেকে অপব্যয় করিয়া বিস্তর অর্থ নষ্ট করিয়া থাকেন। এরূপ করিলে পরিণামে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আয় বুঝিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু কিছু সঞ্চয় করা উচিত। সঞ্চিত অর্থও এরূপ ভাবে খাটান উচিত, যাহাতে তাহতে কিছু লাভ হইতে পারে। সঞ্চিত অর্থ ব্যবসা বাণিজ্যে ও কৃষি কার্য্যে খাটাইয়া অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করা উচিত।

বিদ্যা।

এ সংসারে বিদ্যার সমান ধন নাই। যাঁহার বিদ্যাধন আছে তিনিই

যথার্থ জ্ঞানী এবং জগতে পূজনীয়। এইরূপ নীতিবাক্য প্রচলিত আছে যে, রাজার অপেক্ষা বিদ্বান ব্যক্তির মান্য অধিক। কারণ রাজা স্বদেশে পূজনীয়, কিন্তু বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্য।

বিদ্যাবলে আমরা অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। আমাদের দেশে পূর্ব্বে কত প্রসিদ্ধ ঘটনা হইয়া গিয়াছে, কত প্রসিদ্ধ লোক জন্মিয়াছেন, তাঁহারা দেশের উন্নতির জন্য কত মহৎ কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস পাঠে আমরা এ সকল জানিতে পারি। পৃথিবীতে কত দেশ, কত পর্ব্বত, নদী ও নগর আছে; ভিন্ন ভিন্ন দেশে কত জাতীয় লোক বাস করে ও কত প্রকার শস্য জন্মে ও কত দ্রব্য প্রস্তুত হয়, ভূগোল পাঠে আমরা এই সকল বিষয় জানিতে পারি। বীজ হইতে বৃক্ষ কিরূপে জন্মে, বৃক্ষ হইতে ফল কিরূপে উৎপন্ন হয়, বিজ্ঞান পড়িলে আমরা তাহা জানিতে পারি। জলকে বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া কিরূপে তাহা দ্বারা বাষ্পের শকট পরিচালিত করা যায়, আবার জলকে শীতল করিয়া কিরূপে বরফে পরিণত করা যায় এই সকল বিষয় বিজ্ঞান পাঠে জানা যায়। গণিতের সাহায্যে গণনা করিতে শিক্ষা করা যায়। ফলতঃ বিদ্বান্ ব্যক্তি গৃহে বসিয়া জ্ঞান চক্ষে পৃথিবীর ও আকাশের যাবতীয় তত্ত্ব জানিতে পারেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি জ্ঞান বলে কত নূতন নূতন বিষয় আবিস্কার করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। তাঁহারা সংসারের অহিত নিবারণ করিয়া হিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি বহুগুণের আস্পদ। তাঁহারা শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করেন। কলহ, দ্বেষ ও পরনিন্দা করিয়া অপরের বিরাগভাজন হন না। তাঁহারা বিদ্যাবলে, অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপনার ও আত্মীয় বন্ধুর অভাব মোচন করেন।

শৈশবকালে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিবার উপযুক্ত সময়। গভর্ণমেণ্ট

ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা দিবার জন্য নানা স্থানে বহুবিধ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। চিকিৎসা শিল্প ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য অনেক বিদ্যালয় আছে। লোকের শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া থাকেন।

ব্যায়াম।

শরীরের যে অঙ্গ উপযুক্তরূপে সঞ্চালিত হয়, তাহা বর্দ্ধিত, পুষ্ট ও শ্রমক্ষম হইয়া উঠে। আবার সঞ্চালিত না হইলে, অঙ্গ সকল দুর্ব্বল, শীর্ণ ও শিথিল হইয়া যায়। যাঁহারা মানসিক পরিশ্রমে রত, তাঁহাদের শারীরিক পরিশ্রম করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। ইঁহারা স্বতন্ত্ররূপে শারীরিক পরিশ্রম না করিলে রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইতে পারেন। সুতরাং অবকাশ পাইলেই তাঁহাদের এরূপ শারীরিক পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য, যাহাতে তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সম্পূর্ণ চালনা হইতে পারে। এইরূপ অঙ্গচালনার নাম ব্যায়াম। নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা বহু উপকার লাভ করা যায়। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর। ব্যায়াম নানা প্রকার; যথা—দ্রুতপদে ভ্রমণ, ধাবন, অশ্বারোহণ, নৌকাচালন, হাডুগুডুগ, কপাটী, ব্যাট্‌বল, ফুটবল, ডন্ ফেলা, মুগুর ভাঁজা ইত্যাদি।

ব্যায়ামের মধ্যে পদব্রজে ভ্রমণ অতি সহজ। প্রত্যহ প্রত্যূষে দেড় ক্রোশ বা দুই ক্রোশ ভ্রমণ করা উচিত। ২।৩ জন একসঙ্গে ভ্রমণ করিলে মন বড় প্রফুল্ল থাকে, সুতরাং অধিক শ্রান্তিবোধ হয় না। ভ্রমণকালে হস্তদ্বয় ও বক্ষঃস্থল স্থির না রাখিয়া, কিঞ্চিৎপরিমাণে ইতস্ততঃ চালনা করা উচিত। অতি দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিলে, কোন কোন ব্যক্তি পীড়িত হন। সবল ও সুস্থ শরীরেই দ্রুত গমন ক্লেশকর নহে। যতক্ষণ ক্লেশবোধ না হয়, ততক্ষণ ভ্রমণ করা আবশ্যক।

অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিলে অনেক অংশ সঞ্চালিত হয়, ইহাতে

বক্ষঃস্থল প্রসারিত ও ফুসফুসদ্বয় সবল হইয়া উঠে। ধাবন ও সন্তরণ অনেক সময় পীড়াদায়ক হয়। সন্তরণ কালে দেহস্থ রক্ত মস্তিষ্কাভিমুখে অধিক পরিমাণে ধাবিত হইয়া, শিরোরোগ উৎপাদন করে। কখনও মৃত্যুও উপস্থিত করিয়া থাকে। সন্তরন শিক্ষা করা সকলেরই উচিত। ইহাতে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ধাবনকালে রক্তের গতি অতি দ্রুত হয়, ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে। অধিক্ষণ এরূপ বহিলে হৃদয় ও ফুসফুসের রোগ জন্মে ও অবশেষে মৃত্যুও ঘটিতে পারে।

নৌকায় দাঁড় টানিলেও বক্ষঃস্থল ও বাহুদ্বয় উত্তমরূপে সঞ্চালিত হয়। কয়েকজন বন্ধু একত্র হইয়া এরূপ করিলে আমোদের সহিত শারীরিক পরিশ্রম হয় বলিয়া ক্লেশবোধ হয় না। অল্প সময় হইলে হস্তের পেশীগুলি সর্ব্বদা চালনা করা কর্ত্তব্য। কোন কঠিন দ্রব্যে পুনঃ পুনঃ মুষ্টির আঘাত করিলে হস্তদ্বয় দৃঢ় হয়। হস্তদ্বয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইলে, অনেক সময়ে সহজে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়।

পরিশ্রম।

আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশই আমরা পরিশ্রম দ্বারা লাভ করিয়া থাকি। যে অন্নদ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা হয়, তাহা উপযুক্ত পরিমাণে আহরণ করিতে ভূমিকর্ষণ, বীজবপন প্রভৃতি নানাবিধ শ্রমসাধ্য কার্য্যের প্রয়োজন। যে গৃহে বাস করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা করি, তাহা নির্ম্মাণ করিতে কত শ্রমের আবশ্যক। বস্ত্র, গৃহসামগ্রী প্রভৃতি কোন দ্রব্যই বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পরিশ্রম অশেষ সুখের আকর। যাহারা পরিশ্রম করিতে কাতর হয়, তাহারা কতপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ অনুভব করে,

তাহা বর্ণনা করা যায় না। শ্রম না করিলে আহার, নিদ্রা প্রভৃতি হয় না এবং বুদ্ধিশক্তি নিস্তেজ হইয়া যায়। ফলতঃ যাঁহারা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে অনুক্ষণ রত, তাঁহারা কার্য্য করিতে না পাইলে অত্যন্ত অসুখী হইয়া থাকেন।

আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক শারীরিক পরিশ্রম করিতে লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু যে সকল মহানুভব ব্যক্তি মানব জাতির অশেষ উপকার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা পরিশ্রম করিতে কাতর হইতেন না। রুশিয়ার সম্রাট পীটার স্বহস্তে অর্ণবযান প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন। ফ্রান্স দেশীয় রাজকুমার নেপোলিয়ন মুদ্রাঙ্কন কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাত্মা এব্রাহিম লিঙ্কন প্রথমে নৌকা-চালনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ জর্জ্জ ওয়াসিংটন অবকাশ কালে স্বহস্তে হল চালনা করিতেন। আমেরিকার বেঞ্জানিন ফ্রাঙ্কলিন প্রথমে মুদ্রাযন্ত্রে অক্ষরযোজনা করিতেন।

পরিশ্রম দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সবল ও বর্দ্ধিত হয়। যাহারা কোন প্রকার পরিশ্রম করে না, তাহাদের শরীর নিতান্ত কোমল ও শিথিল হইয়া যায়। আবার অতিরিক্ত পরিশ্রম বশতঃ শরীর দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অভ্যাস পরিশ্রমের প্রধান সাধন। কোন কোন ব্যক্তি অল্প পরিশ্রম করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে; কেহ তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে ক্লেশ বোধ করে না। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিলে অধিক পরিশ্রম সহ্য হইয়া উঠে। বলবান ব্যক্তি দুর্ব্বল ব্যক্তি দিগের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে। দুর্ব্বল ব্যক্তিরাও পরিশ্রম করিতে করিতে সবল হইয়া উঠে। কোন কোন রোগ শুদ্ধ নিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা দূরীভূত হয়।

যেমন শারীরিক পরিশ্রম করিলে শরীর দৃঢ় হয়, সেইরূপ মানসিক পরিশ্রম করিলে, মনোবৃত্তি সকল সতেজ হইয়া উঠে। শারীরিক ও

মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রমই একই নিয়মের অধীন। অতিরিক্ত পরিশ্রম সর্ব্বপ্রকারেই অহিতকর।

পরিচ্ছন্নতা।

শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কার না রাখিলে, কোন রূপেই স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায় না। আমাদের লোম কূপ দ্বারা যে সকল দূষিত পদার্থ প্রতিনিয়ত বাহির হইতেছে, সে সকল কোনরূপে শরীরে থাকিয়া গেলে, রোগ জন্মিতে পারে। শরীরের মলা দূরকরা স্নান ও গাত্রমার্জ্জনের উদ্দেশ্য। সুস্থ শরীরে প্রত্যহ প্রত্যূষে শীতল জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। অবগাহন করিয়া স্নান করিলে, অতি সহজে শরীরের মলা দূর হয়, ও তাহাতে সর্ব্ব শরীরে সুখানুভব হইতে থাকে। গায়ে অধিক ময়লা থাকিলে, সাবান প্রভৃতি দিয়া গাত্রমার্জ্জনা করিতে হয়। স্নানের শেষে শুষ্ক মোটা কাপড় বা রুমাল দিয়া গাত্রমার্জ্জনা করিলে শরীরের স্বাভাবিক তাপ উদ্ভাবিত হয়। অন্যান্য সময়েও গাত্রমার্জ্জনা করা উচিত। প্রত্যহ অন্ততঃ তিনবার এরূপ করিলে রাত্রিকালে শয়ন করিবার পূর্ব্বে উত্তম রূপে গাত্র মার্জ্জন করিলে, শরীর পরিস্কৃত হয়। উহাতে সুনিদ্রার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া উঠে।

আমাদের দেশের অনেকেই মলিন বসন পরিধান ও অপরিস্কৃত শয্যা ও আসনে শয়ন ও উপবেশন করিয়া থাকেন; এরূপ করিলে নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা। সর্ব্বদা এক বস্ত্র পরিধান করিলে তাহা পরিস্কৃত থাকে না; এজন্য গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ দুইবার ও শীতকালে অন্ততঃ একবার বস্ত্র ত্যাগ করা উচিত। রোগ হইলে তিন চারিবার ঐ রূপ করা আবশ্যক। প্রত্যহ পরিধেয় বস্ত্র সুন্দররূপে ধৌত করা ও সপ্তাহ অন্তর একবার রজক গৃহে পাঠান উচিত।

আমাদের শয্যা প্রত্যহ রৌদ্রে দেওয়া ও সপ্তাহে অন্ততঃ একবার শয্যা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। নতুবা তাহা অপক্ষিত হইয়া উঠে। সর্ব্বদা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকিলে মন প্রফুল্ল থাকে।

অপরিস্কৃত থাকিলে মন নিস্তেজ হইয়া যায়। যাহারা সর্ব্বদা পরিস্কৃত থাকে, তাহাদের নানা প্রকার পীড়া জন্মে।

অন্য লোকের বস্ত্র পরিধান, গামছা ব্যবহার ও শয্যায় শয়ন করা অন্যায়। ইহাতে নানা প্রকার সংক্রামক রোগ জন্মিতে পারে।

স্বাস্থ্য।

স্বাস্থ্য অতি অমূল্য ধন। স্বাস্থ্যের হানি হইলে ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুই সুখকর বলিয়া বোধ হয় না। পীড়িত হইলে, পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারা যায় না, অথচ ঔষধ পথ্য প্রভৃতির ব্যয় বহন করিতে হয়। যদি পরিণামে মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে কতই ক্লেশ, কতই পরিতাপের বিষয়। শরীরের সহিত মনেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শরীর সুস্থ না থাকিলে, ক্রমে ক্রমে মনও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আর পূর্ব্বের মত স্ফূর্ত্তি থাকেনা।

আমাদের দেশ বহুদিন হইতে জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি নানাবিধ রোগের আবাসভূমি হইয়াছে। কত শত সমৃদ্ধ গ্রাম যে রোগের প্রকোপে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু কি কারণে এইরূপ হই তেছে এবং কি উপায়েই বা ইহার প্রতিকার করিতে পারা যায়, এবিষয় করিতে অনেকেই ঔদাস্য প্রকাশ করেন। অল্পস্থানে অধিক লোকের বাস বশতঃ অনেক পল্লীগ্রাম, নগর আর পূর্ব্বের ন্যায় পরিস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন নাই। গ্রামের পুরাতন পুষ্করিণী গুলির সংস্কার বিহনে, উহাদের জল দূষিত ও অপরিস্কৃত হইয়াছে। পশুচারণের উপযুক্ত ভূমি যথেষ্ট পরিমাণে না

থাকায়, নিরীহ পশুকুল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিতে পায় না, সুতরাং দুগ্ধাদি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে পুষ্টিকর খাদ্য প্রচুর পরিমাণে লাভ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। পুষ্টিকর খাদ্য ও নির্ম্মল পানীয় জলের অভাবে দিন দিন লোকে রোগগ্রস্ত হইতেছে। বঙ্গদেশের অনেক নদী, খাল স্রোতহীন বা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এজন্য অনেক গ্রাম হইতে বর্ষার জল আর পূর্ব্বের ন্যায় অবাধে নির্গত হয় না। সুতরাং নিকটবর্ত্তী ভূভাগ সকল আর্দ্র থাকিয়া পীড়া উৎপাদন করে।

কোন কারণে কি রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া সুকঠিন। ফলতঃ কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পালন করিয়া চলিলে, সচরাচর সুস্থ শরীরে থাকিতে পারা যায়। অতি ভোজন, দূষিত বায়ু সেবন, দূষিত জলের ব্যবহার, অতিশয় শীত বা তাপ ভোগ, আর্দ্র ও অপরিষ্কৃত স্থানে বাস, পরিশ্রমের অভাব বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে, কোন না কোন প্রকারে অসুস্থ হইতে হয়, তাহার সন্দেহ নাই। স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতে হইলে লঘুপাক, পুষ্টিকর খাদ্য আহার করা উচিত। নির্ম্মল জলপান ও বিশুদ্ধ বায়ুসেবন আবশ্যক। মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পর বিশ্রাম নিতান্ত প্রয়োজন। আলস্য স্বাস্থ্যনাশের প্রধান হেতু। সুনিদ্রা ও নির্দ্দোষ আমোদ বিশ্রামলাভের উপায়। অনিদ্রার ন্যায় বিষম রোগ আর নাই। কিন্তু অতি নিদ্রাও আলস্যের সহচর। পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন না থাকিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। মলিন বসন পরিধান, অপরিষ্কৃত শয্যা ও আসনে শয়ন কিংবা উপবেশন করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। সর্ব্বদা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকিলে, মন প্রফুল্ল থাকে, অপরিষ্কৃত থাকিলে নিস্তেজ হইয়া যায়। প্রফুল্ল মনে সকল কার্য্যই করা যায়, বিষণ্ণ মনে অতি প্রীতিকর বিষয়েও বিরক্তি জন্মে।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রতিদিন কিছুক্ষণ ব্যায়াম করা আবশ্যক। ব্যায়াম করিলে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পুষ্ট হয়। অধিক মানসিক পরিশ্রম করিলে শরীর অসুস্থ হইয়া উঠে।

মৃদাঙ্গার বা পাথুরে কয়লা।

পাথুরে কয়লা খনিতে পাওয়া যায়। আসাম প্রদেশে অনেক কয়লার খনি আছে। ছোটনাগপুর ও রাণীগঞ্জেও বিস্তর কয়লার খনি দেখা যায়। কোন কোন খনিতে কয়লা এত নিম্নে থাকে যে, দুই তিন হাজার ফুট, কখন কখন তাহারও অধিক গভীর কূপ খনন করিলে ভাল কয়লা পাওয়া যায়। পাথুরে কয়লা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ অথচ উজ্জ্বল। খনিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে। কয়লার স্তরের মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকার স্তরও থাকে। এই সকল মৃত্তিকার স্তরে নানা প্রকার উদ্ভিদের শিকড়, কাণ্ড, পত্র প্রভৃতির বিস্তর চিহ্ন পাওয়া যায়। এই সকল দেখিলে অনুমান করা যায় যে, এককালে মৃত্তিকার স্তরগুলি নিবিড় বনে আচ্ছাদিত ছিল। এই সকল বনের বৃক্ষাদি রূপান্তরিত হইয়া পাথুরে কয়লা হইয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর মৃত্তিকার নিম্নে থাকিয়া, ইহাদের বর্ণ ও গুণ এত দূর পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে, ইহারা যে উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন সহসা তাহা জানিতে পারা যায় না।

কাঠ অপেক্ষা পাথুরে কয়লা সুলভ ও কাঠের আগুনের অপেক্ষা পাথুরে কয়লার আগুনের উত্তাপ অধিক। রেলগাড়ী, জাহাজ ও কয়লার কারখানায় প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ পাথুরে কয়লা পোড়ান হয়। বড় বড় সহরের রাস্তায় গ্যাসের আলোক জ্বলে। এই গ্যাস পাথুরে কয়লা হইতে জন্মে। একখণ্ড পাথুরে কয়লা জ্বালিয়া তাহার শিখার ঠিক মধ্যস্থলে একটী পিত্তলের বক্র নলের মোটা মুখটী ধরিয়া অন্য মুখটীর নিকট

নাক লইয়া গেলে, কয়লার গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যায়। এই মুখের উপর একটী জ্বলন্ত দেশলাই ধরিলে গ্যাস জ্বলিয়া উঠে, ও উহা হইতে সুন্দর আলো বাহির হয়। বড় বড় সহরে পাথুরে কয়লা হইতে এইরূপে গ্যাস প্রস্তুত হয়। লোকে সেই গ্যাস নল দিয়া রাস্তায় রাস্তায় ও গৃহে গৃহে লইয়া যায় ও তাহার আলোকে রাত্রে যাতায়াত ও কাজকর্ম্ম করে।

পাথুরে কয়লা পোড়াইলে তাহার অধিকাংশই পড়িয়া থাকে। তাহাকে কোক বলে। কোক সুন্দর জ্বলে, অথচ পাথুরে কয়লা জ্বালিবার সময় যেরূপ দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস বাহির হয়, কোক হইতে সেরূপ গ্যাস বাহির হয় না অনেক স্থানে পোড়াইবার কাঠের মূল্য অধিক; লোকে উহার পরিবর্ত্তে কোক ব্যবহার করে।

কেরোসিন তৈল।

কোন কোন পদার্থ আগুনে ধরিলে আপনা আপনি জ্বলিতে থাকে। আর কতকগুলি একেবারে জ্বলে না। যেগুলি জ্বলে, সেগুলিকে দাহ্য পদার্থ বলে, যেগুলি জ্বলে না সেগুলি অদাহ্য।

পুড়িবার সময়, কতকগুলি দাহ্য পদার্থ হইতে শিখা বাহির হয়; আর কতকগুলি ধীরে ধীরে জ্বলিতে থাকে, শিখা বাহির হয় না। কাঠ, ঘুঁটে, তেল, তুলা, পাথুরে কয়লা ও কেরোসিন তৈল পুড়িবার সময় শিখা বাহির হয়। যে দাহ্য পদার্থগুলির শিক্ষা হয়, তাহাদিগের অধিকাংশ উদ্ভিজ্জজাত। কেরোসিন তৈলের মত দাহ্য পদার্থ জগতে অল্পই আছে।

একপ্রকার পাথুরে কয়লা আছে, তাহাদিগকে চুয়াইলে কেরোসিন তৈলের মত একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হয়। পৃথিবীর অনেক স্থানে কেরোসিন তৈলের খনি আছে। যে মৃত্তিকায় কেরোসিন তৈল

আছে, সেখানে কূপ খনন করিলে, কূপের মধ্যে তৈল আসিয়া জমে। কোন কোন কূপে তৈল এত দ্রুতবেগে আসিয়া জমে, যে, কূপ পরিপূর্ণ হইয়া উৎসের ন্যায় উপরে উঠে। আসামে ডিগ্‌বয় নামক স্থানে কয়েকটী কেরোসিন তৈলের কূপ আছে। খনি হইতে বিশুদ্ধ কেরোসিন তৈল পাওয়া যায় না। উহার সহিত নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। ইহাদের মধ্যে মোমের মত একটী পদার্থ আছে; ইহাকে প্যারাফিন বলে। মোমের ন্যায় প্যারাফিন হইতেও বাতি প্রস্তুত হয়।

লবণ।

লবণ আমাদিগের মহোপকারী ও প্রয়োজনীয় বস্তু। লবণসংযোগে প্রায় সমস্ত খাদ্য দ্রব্যই সুস্বাদু হইয়া থাকে। লবণ ধনী ও নির্ধন সকলেরই নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। উহা নানাপ্রকার রোগের মহৌষধ। অনেক দিন লবণ ব্যবহার না করিলে শরীর রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। উহা আমাদের শরীর রক্ষার পক্ষে একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ। পরিমিত লবণ ব্যবহার যেমন স্বাস্থ্যপ্রদ, লবণের অতিরিক্ত ব্যবহারেও তেমন অপকারক। লবণ অধিক আহার করিলে উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মে।

লবণ প্রধানতঃ দুই প্রকার :—খনিজ ও অম্বুজ। সৈন্ধব, সম্বর, কর্কচ, বিট প্রভৃতি অনেক প্রকার লবণ এদেশে ব্যবহৃত হয়। সিন্ধুদেশে লবণের খনি আছে, ঐ লবণকে সৈন্ধব লবণ কহে। সাগরের জল জ্বাল দিলে, তাহার জলীয় ভাগ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, লবণাংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহাকে অম্বুজ লবণ কহে।

বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ড হইতে লবণ আনীত হয়। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে লবণের খনি আছে। আফ্রিকা দেশে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহা হইতে লবণ প্রস্তুত হয়, এই নিমিত্ত ইহাকে লবণ বৃক্ষ বলে। সকল দেশে

সমান পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু এক্ষণে বাণিজ্যের সাহায্যে একদেশের উৎপন্ন দ্রব্য অনায়াসে অন্যদেশে প্রেরিত হইতেছে। সুতরাং কোন স্থানেই আর এখন লবণের অভাব দৃষ্ট হয় না। একসময়ে আফ্রিকা দেশে লবণ অতি দুষ্প্রাপ্য ছিল। পণ্ডিতেরা বলেন, লবণ ক্লোরিণ ও সোডিয়াম নামক পদার্থদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন।

হীরক।

ভারতবর্ষের মধ্যে সম্বলপুরে হীরকের খনি আছে। সম্বলপুর প্রদেশের মধ্য দিয়া মহানদী প্রবাহিত হইয়াছে। ঐ প্রদেশের উত্তর সীমায় অনেক পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পর্ব্বত হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকল উৎপন্ন হইয়া মহানদীতে পতিত হইয়াছে। ঐ সকল নদীর জল স্রোতের সহিত হীরক ও স্বর্ণ মহানদীতে আসিয়া পড়ে। মহানদীর সহিত যে যে স্থানে ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সংযোগ হইয়াছে, সেই সেই স্থানে অনুসন্ধান করিলে হীরক ও স্বর্ণ পাওয়া যায়। চন্দ্রপুর নামক স্থানে প্রায় যাইট ক্রোশ বিস্তৃত একটী বালুকাময় চর আছে। এই চরে যে পরিমাণে হীরক পাওয়া যায়, অন্য কোন স্থানে সেরূপ দেখা যায় না। লোকে বর্ষার শেষে ঐ চরে আসিয়া হীরক অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করে। হীরক সংগ্রহ করা অতি সহজ। লোকে মহানদীর গর্ভ হইতে বালুকা তুলিয়া উহার তীরে স্তূপাকার করে। পরে সেই বালুকা হইতে হীরা বাহির করে। হীরক সংগ্রহ করিতে হইলে অধিক যন্ত্রাদির প্রয়োজন হয় না। প্রথমে কোদাল দ্বারা মাটি কাটিয়া উপরে তুলিতে হয়। এবং ঐ সকল মৃত্তিকা ও বালুকাদি একখানি দীর্ঘ ও প্রশস্ত কাঠের তক্তার উপর রাখিয়া অল্প পরিমাণে হেলাইয়া ধরিতে হয়। পরে তাহার উপর অল্প অল্প জল

চালিয়া দিলে, বালি ও মাটি ধুইয়া যায়, এবং হীরক, স্বর্ণ প্রভৃতি অবশিষ্ট থাকে। তৎপরে অপর একখানি তক্তায় ঐ সকল দ্রব্য তুলিয়া সূর্য্যকিরণে ধরিলে, সহজেই হীরক ও স্বর্ণাদি বাছিয়া লইয়া যায়।

লোকে হীরকের উজ্জ্বলতা অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি নাম দিয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ নামক হীরকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্। কহিনুর নামক অত্যুৎকৃষ্ট হীরক ভারতবর্ষ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। ইহা আমাদের সম্রাটের মুকুটে শোভা পাইতেছে। ইহার মূল্য তিন কোটী পঞ্চাশ লক্ষ। ভারতবর্ষ ব্যতীত অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় হীরকের খনি আছে। সময়ে সময়ে কোন কোন কয়লার খনিতেও হীরক পাওয়া যায়। হীরকের দ্বারা অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়া থাকে। হীরকের আর একটী গুণ এই যে, উহা দ্বারা কাচ কাটা যায়। হীরকের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ কাচের উপর টানিয়া গেলে দাগ পড়ে, পরে দুই ধারে জোর দিলেই ঐ দাগে ভাঙ্গিয়া যায়।

রেশম।

রেশমের ব্যবহার বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে নানা প্রকার রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সাটীন, কিংখাপ, বারাণসীসাটী, বালুচরেরচেলী, ভাগলপুরের বাফ্‌তা, মেদিনীপুরের এণ্ডী ও তসরের বস্ত্র এবং আসামের এড়ী, মুগা ও পট্টবস্ত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত বস্ত্র একই প্রকার রেশমে প্রস্তুত হয় না। যে সকল গুটীপোকা হইতে রেশম প্রস্তুত হয়, তাহাদের কতকগুলি তুত গাছের পাতা, কতকগুলি কুলগাছের পাতা, কোন কোন পোকা আসাম ও শাল পাতা, কোন কোন পোকা এরণ্ড পাতা,

আবার কতকগুলি পোকা সোম নামক গাছের পাতা খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে যে পোকা তুত গাছের পাতা খায়, তাহার রেশম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বঙ্গদেশে, সিংহভূম, মানভূম, বীরভূম, বাঁকুড়া, সাঁওতালপরগণা, হাজারিবাগ রাঁচি প্রভৃতি জেলায় ও আসাম প্রদেশে গুটীপোকা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে রেশম প্রস্তুত হয়।

সচরাচর তিন প্রকার গুটী পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। বড়পোকা, চীনে পোকা, ও ছোট পোকা। বড় পোকার রেশমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহারা বৎসরে একবার মাত্র ডিম্ব প্রসব করে। চীনে ও ছোট পোকাও এইরূপ একবার মাত্র ডিম্ব প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। ঐ ডিম্ব হইতে যে কীট জন্মে, তাহারাও ডিম্ব প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। এইরূপে ইহারা বৎসরে ৮।৯ বার ডিম্ব প্রসব করে। কিন্তু বড় পোকার ন্যায় এই দুই জাতীয় ডিম্ব দীর্ঘকাল পরে ফুটে না। প্রসবের পর চীনে পোকার ডিম্ব ৭ দিন ও ছোট পোকার ডিম্ব ৯ দিন পরে ফুটিয়া উঠে। এই তিন প্রকার কীটই তুত গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে।

ডিম্বগুলি পোস্তদানার ন্যায় ক্ষুদ্র ও শুভ্রবর্ণ। উহা ফুটিবার এক দিবস পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। তাহার পরদিবস এই ডিম্ব ফুটিয়া উহা হইতে অতি সূক্ষ্ম শূয়াপোকার ন্যায় কীট বাহির হয়। ডিম্ব সকল ফুটিলে, কৃষকেরা অতি কোমল তুতপাতা সূক্ষ্ম করিয়া কাটিয়া ঐ পোকাগুলিকে খাইতে দেয়। ৮ দিবস, দিবসে তিন বার করিয়া আহার করিয়া পোকাগুলি কিছু বলিষ্ঠ হইলে, আর উহাদিগেকে পাতা কাটিয়া দিতে হয় না। এই সময়ে উহারা একদিন ও এক রাত্রি নিদ্রা যায়। নিদ্রাভঙ্গ হইলে পর, কৃষকেরা উহাদিগকে কোমল তুতপাতা খাইতে দেয়। উহারা ৬ দিবস পাতা খাইয়া পুনরায় নিদ্রা যায়। দ্বিতীয়-বার নিদ্রা ভঙ্গের পর আবার ৬ দিন পাতা খাইয়া নিদ্রা যায়।

পরে আবার ৬ দিন পাতা খাইয়া চতুর্থ বার নিদ্রা যায়। প্রত্যেক নিদ্রার পর প্রায় উহারা গাত্রের খোলস ছাড়ে। চতুর্থবার নিদ্রা ভঙ্গের পর প্রায় ১০।১২ দিন প্রত্যহ ৩ বার করিয়া পাতা খাইয়া দুই একটী পোকা ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ হয়। তখন উহারা অবিরত তিন দিবস মুখ হইতে সূত্রের ন্যায় এক প্রকার লালা বাহির করে। এই লালাতেই তাহাদের শরীর আবৃত হয়; এবং তন্মধ্যে নিজে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই লালা বায়ুতে শুষ্ক হইলেই কঠিন হয়। এইরূপে গুটির সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ১৫ দিন থাকিলে, উহারা শূঁওপোকার ন্যায় আকার ত্যাগ করিয়া গুটির মধ্যে খেজুর আঠীটির মত হয়। যখন তাহারা গুটির মুখ কাটিয়া বাহির হয়, তখন সুন্দর প্রজাপতির রূপ ধারণ করে। এমন সময়ে কৃষকেরা গুটিগুলিকে রৌদ্রে বা অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া গুটির মধ্যস্থ কীটগুলিকে নষ্ট করে। তৎপরে গুটি-গুলিকে উষ্ণ জলে ফেলিয়া বাঁশের শিকড়ের মার্জ্জনী দ্বারা গুটির গাত্র হইতে তার টানিয়া বাহির করে, এবং পাক দিয়া চরখায় জড়াইয়া রাখে। এই সূত্রকেই রেশম বলে। কাটা গুটি হইতে যে সূত্র বাহির হয়, তদ্দ্বারা মটকা বা মুখকাটা প্রভৃতি মোটা রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বদনগঞ্জ, কয়াপাট, ফুলুট, শ্যামবাজার, বন আনন্দপুর প্রভৃতি গ্রামে অধিক তসরের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দয়া।

পরের দুঃখমোচন করিবার জন্য আমাদের অন্তঃকরণে যে প্রবৃত্তি আছে তাহার নাম দয়া। দয়ার তুল্য ধর্ম্ম নাই। যাহার হৃদয়ে দয়া নাই সে পশুর সমান। যাঁহার হৃদয়ে দয়া আছে, তিনিই যথার্থ সাধু। পরের দুঃখ দেখিলে যাহার পাষাণ হৃদয় দয়ার সঞ্চার হয় না, তাহার

তুল্য নরাধম আর এ সংসারে কে আছে? অন্ধ, খঞ্জ, অনাথ, অসহায় দরিদ্রগণের দুঃখে যে কাতর হয় না, তাহাতে আর পশুতে কি প্রভেদ? যিনি পরের দুঃখ দর্শনে দুঃখিত হইয়া, তাহাদিগের দুঃখ বিমোচনের জন্য আপনার সুখ বিসর্জ্জন করেন, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য। ঈশ্বর দয়াময়; দয়াহীন মনুষ্যেরা কখনই ভগবানের কৃপালাভে সমর্থ হয় না। কেবল দয়াবান্ সাধুপুরুষেরাই তাঁহার কৃপার পাত্র।

এক সময়ে একটী ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে একজন উচ্চ পদস্থ সৈনিক পুরুষ ছিলেন। তিনি অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার অশ্ব মারা পড়িল। তখন আর একটী অশ্বের উপর চড়িয়া তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই অশ্বেরও সেই দশা হইল। আর একটী অশ্বে চড়িবার সময়, তিনি নিজে আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। ক্ষত স্থান হইতে এত রক্ত বাহির হইল যে, তাঁহার আর উত্থান শক্তি রহিল না। কতকগুলি সিপাহী তাঁহাকে বহন করিয়া শিবিরে লইয়া গেল। যুদ্ধে আহত হইলে লোকের অত্যন্ত তৃষ্ণা পায়। যুদ্ধস্থলে জল পাওয়াও দুষ্কর। সৈনিকপুরুষ পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া জল চাহিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটী পাত্রে সামান্য একটু জল আনিয়া তাঁহাকে দেওয়া হইল। জলপান করিবার জন্য যেমন তিনি পাত্রটী মুখে তুলিয়াছেন, অমনি দেখিতে পাইলেন যে, একজন আহত সিপাহী সেই পাত্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার কাতর দৃষ্টি দেখিয়া, তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইল যে, সে ব্যক্তিও পিপাসায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি আর জল পান করিতে পারিলেন না। সিপাহীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার অপেক্ষা তোমার জলের অধিক প্রয়োজন" এই বলিয়া তখনই সেই জল তাহাকে পান করিতে দিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন।

তিনি যে কেবল একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন এমন নহে। সুকবি বলিয়াও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। এই দয়ালু সাধু পুরুষের নাম স্যার্ ফিলিফ্ সিড্নি। প্রায় ৩০০ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যে দয়ালু হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কথা আজও লোকে ভুলিতে পারে নাই।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি।

পরমেশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহারই ইচ্ছায় আমাদের জন্ম ও মৃত্যু হয়; এবং তাঁহারই কৃপায় আমরা জীবিত থাকি। আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, কিন্তু তিনি সকল সময়ে সকলকেই দেখিতে পান। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলই জানেন। তাঁহারই ইচ্ছায় দিবারাত্রি হইতেছে। তাঁহারই আজ্ঞায় সূর্য্য তাপ ও আলোক দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, এবং পৃথিবী শস্য উৎপাদন করিয়া জীবগণকে আহার দিতেছে।

পরমেশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার কর্ত্তা পুণ্যবান্ লোকদিগকে তিনি স্বর্গসুখ প্রদান করেন; আর পাপিষ্ঠ নরাধমদিগকে তিনি নরক যন্ত্রণা দেন। তিনি এমনি করুণাময়, যে অশেষ পাপ করিয়াও যে পাপী অনুতপ্ত হইয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার পতিতপাবন নাম কীর্ত্তন করে, সেও তাঁহার কৃপায় উদ্ধার হইয়া যায়। অতএব সর্ব্বদা তাঁহার নাম স্মরণ করা উচিত। সর্ব্বদা পুণ্য কার্য্য করা উচিত; তাহা হইলেই তাঁহার প্রিয় কার্য্য করা হইবে এবং তাঁহার প্রতি ভক্তি দেখান হইবে। তিনি পুণ্যময় ও মঙ্গলময়; প্রাতঃকালে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করা উচিত এবং রাত্রিতে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। সর্ব্বকার্য্যে তাঁহার মঙ্গলময় নাম স্মরণ করিলে, তিনি মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন।

মাতাপিতার প্রতি ভক্তি।

পিতা আমাদিগকে জন্ম দিয়াছেন, মাতা গর্ভে ধারণ করিয়া কত কষ্টে আমাদিগকে লালন পালন করিয়াছেন। মাতাপিতাকে ভক্তি করা উচিত। তাঁহাদের মনে যাহাতে দুঃখ হয়, এমন কার্য্য কদাপি করা উচিত নহে। তাঁহারা যাহা করিতে বলেন, সেই কার্য্য করা এবং তাঁহারা যাহা নিষেধ করেন সেই কার্য্য না করাই সুসন্তানের কর্ম্ম। তাঁহাদের যদিপীড়া হয়, প্রাণপণে শুশ্রূষা করা উচিত। এবং যখন তাঁহারা বৃদ্ধাবস্থায় কার্য্য করিতে অক্ষম হন, তখন সাধ্যমতে তাঁহাদের সেবা করিতে হয়। আমরা যখন নিতান্ত শিশু ছিলাম, কথা কহিতে পারিতাম না, চলিতে পারিতাম না, তখন তাঁহাদেরই যত্নে জীবিত ছিলাম। তাঁহারা যদি যত্ন না করিতেন, তাহা হইলে কখনই আমরা এত বড় হইতে পারিতাম না। অতএব ভক্তিপূর্ব্বক সতত তাঁহাদের সেবা করা উচিত। তাহা হইলে তাঁহারা যে কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদিগকে পালন করিয়াছেন, তাহার কথঞ্চিৎ পরিশোধ হইবে। পরন্তু তাঁহাদের ঋণ সম্যক পরিশোধ করা অসম্ভব। প্রাতঃকালে পিতা ও মাতার চরণে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করিতে হয় তাঁহাদের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া কলেবর পবিত্র করা উচিত। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করা উচিত। যাহাতে তাঁহারা প্রসন্ন হন, তাহাই করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে পুত্র কন্যা হইতে মাতা পিতা সুখী হন, সেই পুত্র কন্যাই ধন্য। আর যে সন্তান হইতে মাতাপিতার সুখ হয় না, সে সন্তান হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই ভাল। রামায়ণে উল্লেখ আছে রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করিতে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে মৃত দ্বারকানাথ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহোদয়গণ মাতাপিতার একান্ত অনুগত ছিলেন। মহামান্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের জর্জ ছিলেন। তাঁহার মাতৃদেবীর জীবিতকালে তিনি মাতৃপদ পূজা না করিয়া অন্য কার্য্য করিতেন না। ইঁহারাই মাতাপিতার প্রকৃত সুসন্তান।

রাজভক্তি।

মহাপ্রতাপান্বিত পঞ্চম জর্জ্জ এখন আমাদের সম্রাট্। আমরা তাঁহারই প্রজা। রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ অতি গুরুতর। মাতাপিতার সহিত সন্তানের যে সম্বন্ধ, রাজার সহিত প্রজার সেই সম্বন্ধ। রাজা মাতাপিতা স্বরূপ, প্রজা তাঁহার সন্তান তুল্য। মাতাপিতা যেমন সন্তানের হিত কামনায় নিরত থাকেন, রাজাকেও সেইরূপ প্রজার হিত কামনায় নিযুক্ত থাকিতে হয়। সন্তান যেমন মাতাপিতার সেবায় মনপ্রাণ অর্পণ করেন, প্রজাকেও সেইরূপ রাজ সেবায় মনপ্রাণ অর্পণ করিতে হয়।

রাজা দেশের রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহার দণ্ড ভয়ে চোর চুরি করিতে পারে না। প্রবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না। এই নিমিত্ত প্রজাগণ আপন আপন ধন সম্পত্তি লইয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসার নির্ব্বাহ করিতেছেন।

রাজা প্রজার হিতের নিমিত্ত বিচারালয় ও বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। গমনাগমনের সুবিধার জন্য জলে স্থলে পথ ঘাট সুগম করিয়া রাখিয়াছেন। শান্তিরক্ষার জন্য সৈন্য নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যাহাতে প্রজার কষ্ট দূর হয়, রাজা তাহারই উপায় বিধান করিতেছেন।

এক্ষণে প্রজার কর্ত্তব্য,—রাজাকে দেবতাবোধে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবে, তাঁহার নিয়ম পালন করিবে, অনুগত হইয়া থাকিবে, সদা সর্ব্বদা রাজাজ্ঞা মান্য করিয়া চলিবে। বাল্যকাল হইতে সকলে এইরূপে

প্রজার কর্ত্তব্য শিক্ষা করিলে, উত্তরকালে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

ভাই ভগিনীর প্রতি কর্ত্তব্য।

ভ্রাতা ও ভগিনী এক জননীর গর্ভে জন্মিয়াছেন, এক জনকের দ্বারা লালিত পালিত হইয়াছেন, এক জননীর স্নেহে ও মমতায় পুষ্ট হইয়াছেন। এইরূপ ভাইভগিনী পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃবৎ ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী মাতৃবৎ পূজ্যা ও মাননীয়া। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনী পুত্র ও কন্যাবৎ স্নেহের পাত্র। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এই চারি ভ্রাতার ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের চরিত্র আলোচনা করিলে ভ্রাতৃস্নেহ ও ভ্রাতৃভক্তির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ভাই ভগিনীর সদ্ভাবের অভাবে কত সুখের সংসার বিষময় হইয়াছে। মহারাণা প্রতাপ সিংহ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শক্তসিংহ উভয়ের বিবাদ করিয়া বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। কেবল যে সহোদর ভাই ভগিনীর প্রতি স্নেহ মমতা দেখাইতে হইবে এরূপ নহে। মহামতি ভীষ্ম বিমাতার সন্তান গণের প্রতি চিরানুকূল ছিলেন। পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরও চিরশত্রু দুর্য্যোধনকে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া ভ্রাতৃস্নেহ দেখাইয়াছেন।

ভাই ভগিনীর স্নেহের তুলনা বোধ হয় জগতে আর নাই। ভগিনী দূরস্থ স্বামীগৃহে থাকিয়া নিয়ত ভ্রাতার শুভ কামনা করেন। যদি কেহ ভ্রাতাকে নিন্দা করে, তাহাতে ভগিনী মনে বড়ই ব্যথা পান। ভ্রাতার মুখ দেখিবার জন্য ভগিনীগণ নিয়ত ব্যাকুল, এবং ভ্রাতৃমুখ দেখিতে পাইলে যেন তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। বাস্তবিক স্নেহময়ী ভগিনীর এইরূপ স্বর্গীয় পবিত্র ভাবের সহিত পৃথিবীর অপর কোন সম্বন্ধের তুলনা

হয় না। যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ ভগিনী পতিপুত্রবিহীনা হন, তখন ভ্রাতাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হওয়া উচিত। তিনি যাহাতে কোনরূপ দুঃখ অনুভব না করেন, সেজন্য ভ্রাতার নিয়ত চেষ্টা করা উচিত। ভ্রাতা ও ভগিনীর পুত্রকন্যার প্রতি নিজের পুত্রকন্যার ন্যায় স্নেহ ও মমতা দেখান উচিত। যদি কোন ভ্রাতার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণ যাহাতে নিরাশ্রয় না হয়, তজ্জন্য ভ্রাতৃগণের চেষ্টা করা উচিত। মৃত ভ্রাতার পুত্রকন্যাগণ যাহাতে পিতার অভাব বোধ করিতে না পারে, তাহাদিগকে সেইরূপ যত্ন করা উচিত।

সময়ে সময়ে অকিঞ্চিৎকর বিষয়সম্পত্তি লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইতে দেখা যায়, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। সহিষ্ণুতা গুণ না থাকিলে সংসার রক্ষা হইত না। এরূপ স্থলে এক পক্ষের ক্ষতি সহ্য করা উচিত। ভ্রাতৃ-কলহে যে কত সুখের সংসার নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

শিক্ষকের প্রতি কর্ত্তব্য।

শিক্ষক আমাদের পূজ্য ও মাননীয়। দর্শন, শ্রবণ, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে মানুষ ও পশুতে কোন প্রভেদ নাই। কেবল একমাত্র জ্ঞানবলেই মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ; শিক্ষক সেই জ্ঞানদাতা। জ্ঞানই মানুষের সর্ব্বপ্রকার সুখের মূল। অতএব যিনি আমাদের একটী অক্ষরও শিক্ষা দেন, তিনিই আমাদের ভক্তিভাজন। পাঠকালে শিক্ষকের প্রতি যেরূপ সম্মান দেখান উচিত, পাঠ শেষ হইলেও সেইরূপ করা বিধেয়। শিক্ষক যে আসনে উপবেশন করেন, তাহাতে ছাত্রগণের উপবেশন করা কখনই উচিত নহে। শিক্ষকের সম্মুখে গমন করিবার সময় বিনীতভাব অবলম্বন করা উচিত। শিক্ষক সন্তুষ্ট না থাকিলে, শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সুন্দর হয় না। পথে ঘাটে যখন যেখানে তাঁহার সহিত দেখা

হইবে, তখনই তাঁহাকে ভক্তি দেখান উচিত। পথে চলিবার সময় তাঁহার সহিত দেখা হইলে, কখন তাঁহার অগ্রে যাওয়া উচিত নয়। যাহা আমরা জানি না, এবিষয় জানিতে হইলে, শিক্ষকের নিকট অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করা উচিত। জিজ্ঞাসার সময় যেন কোনপ্রকার ঔদ্ধত্য প্রকাশ না পায়। নিজে অধিক জানি, ইহা দেখাইবার জন্য বা বৃথা যোগ্যতা প্রকাশ করিবার জন্য, বৃথা প্রশ্ন করা উচিত নহে। ইহাতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায় না; পরন্তু শিক্ষকগণ ইহাতে রুষ্ট হন। শিক্ষকের পত্নীকে মাতৃবৎ ভক্তি করা উচিত। গুরুভক্তি না থাকিলে বিদ্যা শিক্ষা করা যায় না। মহাভারতে আয়ুধধম্য নামে এক মুনির উল্লেখ আছে। আরুণি নামে তাঁহার এক শিষ্য ছিলেন। তিনি গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুভক্তি দেখিয়া আয়ুধধম্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। পরে আরুণি নানাবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। যাঁহাদের প্রকৃতি সৎ, তাঁহারা পাঠ্যাবস্থার পর কৃতী ও উচ্চপদস্থ হইয়াও বাল্যকালের শিক্ষাগুরুর প্রতি ভক্তি দেখাইয়া থাকেন।

জীবজন্তুর প্রতি কর্ত্তব্য।

'জীবে দয়া কর' ইহা সকল ধর্ম্মের বিশেষ বিধি। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, যে কোন জীব হউক না কেন, তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা উচিত। অনেক আমোদপ্রিয় ব্যক্তি পক্ষীদিগকে পোষণ করিবার ছলে, পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তাহাতে যে পক্ষীদিগকে কিরূপ কষ্ট ও যাতনা দেওয়া হয়, তাহা তাহারা কিছুমাত্র বিবেচনা করে না। পক্ষিশাবক গ্রহণকালে তাহাদিগের মাতাপিতার মনে ক্লেশ দেওয়া হয়। তাহার পর ঐ সকল পক্ষী স্বাধীনভাবে থাকিলে তাহারা যেরূপ অবস্থায় বিচরণ করিতে পাইত, আবদ্ধ রাখিলে সেরূপ পায় না। সচরাচর

দেখা যায়, পোষা পাখী অকালে মরিয়া যায়; অতএব পাখী পোষা এক প্রকার জীবহত্যা করা মাত্র। কেহ কেহ কুকুরের লাঙ্গুল ছেদন করিয়া দেয়। এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য নিতান্ত গর্হিত। গো, অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতি পশুগণ যে পরিমাণে ভারবহন করিতে সমর্থ, তাহাদের উপর তদপেক্ষা অধিক ভার চাপাইয়া অনবরত কশাঘাত করা অতীব নিষ্ঠুরের কার্য্য। এইরূপে জীবজন্তুদিগকে ক্লেশ দেওয়া প্রকৃত মনুষ্যের কার্য্য নহে। দয়া মনুষ্যের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। জীবের কষ্ট দেখিলে, মানুষের মনে স্বভাবতঃই দয়ার সঞ্চার হওয়া উচিত। যাঁহাদের এরূপ না হয়, তাঁহারা মনুষ্যনামের অযোগ্য। চেতন পদার্থ মাত্রেরই সুখ দুঃখের জ্ঞান আছে। আমাকে আঘাত করিলে আমার যেরূপ কষ্টবোধ হয়, একটী পশু কিংবা পক্ষীকে আঘাত করিলেও তাহারও তদ্রূপ ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে। বুদ্ধদেবের জীবনে সর্ব্বজীবে দয়ার ভাবের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈনগণ এখনও অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গদিগকে বধ করা মহাপাপ মনে করেন। বিলাতে ও কলিকাতায় পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্য অনেক সভা হইয়াছে। বাস্তবিক রুগ্ন, অসহায়, অকর্ম্মণ্য পশুদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শনের তুল্য মহৎ কার্য্য আর নাই। সম্প্রতি গো-সংরক্ষিণী সভা প্রভৃতির কার্য্যপ্রণলী দেখিয়া বোধ হয় পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে জীবে দয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র প্রাণীকে কষ্ট দিয়া দয়া প্রবৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা উচিত নহে। সর্ব্বজীবে দয়া প্রকাশ করিতে শিক্ষা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে এই কোমল প্রবৃত্তি ক্রমে বিকসিত হইয়া জীবনের অলঙ্কার হইবে।

অতিথি-সেবা।

পুরাকালে অতিথির অতিশয় সম্মান ও সমাদর ছিল। গৃহস্থের গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ হইয়া গেলে, তাঁহারা মহাপাপ মনে করিতেন। এখনও অনেক হিন্দু-গৃহে বৃদ্ধেরা এই আতিথেয় ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। নিজেরা না খাইয়াও অতিথিকে খাওয়াইয়া থাকেন। আরব জাতি ও স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য জাতিও এই অতিথি সেবার জন্য জগতে বিখ্যাত। ভয়ানক শত্রুও গৃহে আশ্রয় লইলে আরবেরা তাহাকে বধ করে না। তাহারা অতিথি সহ একত্র রাত্রিযাপন করে, এক শয্যায় শয়ন করে, অথচ, উভয়ে উভয়ের পরম শত্রু। ইতিহাসে এরূপ ঘটনার বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আতিথেয়ধর্ম্ম পালন করিতে আমাদের যত্ন করা উচিত। বাটীতে অতিথি আসলে স্বয়ং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইতে হয়, এবং যাহাতে অতিথির কোন কষ্ট না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

যথাসাধ্য সকলের সেবা করা, দীনহীনের দুঃখ দূর করা, সকল জাতীয় লোকের উপকার করা, আমাদের পক্ষে প্রধান ধর্ম্ম। দেখিতে পাওয়া যায়, আজকাল অনেকে ভিক্ষুকের প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন, এমনকি অনেকে তাহাদের প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করেন, ইহা অতিশয় নিন্দনীয়। ভারতবর্ষে আতিথেয়তা বিষয়ে এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, "এক কপর্দ্দক হস্তে না লইয়াও, সমগ্র ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করা যায়।" মহাভারত পাঠে জানা যায়, বনবাস কালে পাণ্ডবেরাও অতিথি সেবায় বিমুখ ছিলেন না। মহাবীর কর্ণও অতিথি সেবায় দাতাকর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতে আতিথেয়তা বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত আছে। রাণী ভবানী অতিথি সৎকারের জন্য প্রাতঃ-

স্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। বস্তুতঃ ক্ষুধাতুরকে অন্নদান ও তৃষ্ণাতুরকে জলদানের তুল্য পুণ্যকর্ম্ম আর কিছুই নাই।

পরশ্রীকাতরতা।

পরশ্রী দেখিয়া কাতর হওয়া অতি নীচাশয়ের কর্ম্ম। পরের উন্নতি দেখিয়া কখন দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। পরের ভাল দেখিয়া ঈর্ষা করিলে, তাহাতে অন্যের কোন ক্ষতি হয় না, কেবল নিজের মনকে কষ্ট দেওয়া হয়। যিনি পরের ভাল দেখিলে সুখী হন, তিনি একরূপ পরের সুখের অংশী হন। অন্যে যে সকল সদুপায় অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব অবস্থার উন্নতি করিতেছে, সেই সকল উপায়ে আপনারা উন্নতি করিতে যত্নবান হওয়া উচিত। কিন্তু পরের উন্নতির পথে কখনও কোনরূপ আঘাত জন্মাইতে যাওয়া নীচের কর্ম্ম। যদি কেহ আমা অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাভ্যাস কি ধনোপার্জ্জন দ্বারা লোকের নিকট যশস্বী হন, তাহা হইলে ঈর্ষা না করিয়া আমারও সেইরূপ হইতে চেষ্টা করা উচিত। অন্যের উন্নতি দেখিয়া সুখী হওয়াই কর্ত্তব্য, এবং নিজের উন্নতি করিতে চেষ্টা করাই বিধেয়। কিন্তু কাহারও উন্নতি দেখিয়া বিষণ্ন হওয়া উচিত নহে।

যদি আমার অবস্থা ভাল না হয়, আমি দরিদ্র হই, তাহা হইলেও আমার দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। একবার যদি আমরা লোকের অবস্থা ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, অনেকের অবস্থা আমার অপেক্ষা অনেক মন্দ রহিয়াছে। আর যদি ঈশ্বরানুগ্রহে আমার অবস্থা ভাল হয়, তাহা হইলে গর্ব্ব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। একবার ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব, আমার অপেক্ষা কত লোকের অবস্থা আরও ভাল:আছে এবং কত লোক আমা অপেক্ষা ধনবান ও ঐশ্বর্য্যশালী।

অতএব মন্দ অবস্থা হইলেও দুঃখিত হওয়া বা ভাল অবস্থা হইলেই গর্ব্বিত হওয়া উচিত নহে।

সময়ের সদ্ব্যবহার।

সময় অমূল্য ধন; সময়ের সদ্ব্যবহারে আমাদের উন্নতি এবং অপ-ব্যবহারে অবনতি হইয়া থাকে। কি কৃষি, কি শিল্প, কি বিজ্ঞান, সকল বিষয়ের উন্নতি সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। এই পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি, সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারাই উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছেন। যে সকল বালক বাল্যকালে সময় নষ্ট না করিয়া, মন দিয়া লেখাপড়া শিখিয়া থাকে, তাহারাই ভবিষ্যতে গণ্যমান্য হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই সময়ের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, এক মুহূর্ত্তও বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নহে।

বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ হইয়া থাকে; কিন্তু মৃত্যু পর্য্যন্ত শিক্ষা করিলেও, মনুষ্যের শিক্ষা সমাপ্ত হয় না। এজন্য প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট না করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিয়া থাকেন। মূর্খ লোকেরাই এই অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিয়া থাকে। আলস্য পরায়ণ ব্যক্তিরা বৃথা সময় নষ্ট করিয়া, আপনাদিগের দুঃখ আপনারাই ডাকিয়া আনে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা নিজেই যে তাহাদের দুঃখের কারণ তাহা বুঝিতে পারে না। তাহারা যত কষ্ট পায়, ততই স্ব স্ব অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে।

অলস লোকের দুঃখের সীমা থাকে না। তাহাদের মনে নানাপ্রকার পাপ চিন্তার উদয় হইয়া থাকে। মনকে যে পথে চালিত করিবে, সেই পথেই চলিবে; এজন্য প্রায়ই দেখা যায়, সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিদিগের

অন্তঃকরণ সতত জগতের হিত চিন্তায় নিযুক্ত থাকে। আর অসৎ ব্যক্তিদিগের মন সতত পাপচিন্তায় নিয়ত থাকে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎ সংসর্গ এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও নির্দ্দোষ কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও সময়ের সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে।

বাল্যকাল হইতেই সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা করা উচিত। সময়কে বিভাগ করিয়া, প্রত্যেক কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা উচিত। এবং যে সময়ের যে কার্য্য, সেই সময়ে তাহা সম্পাদন করা আবশ্যক। এইরূপ নিয়মে কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করিলে, সময়ের সদ্ব্যবহার হইবে।

জ্ঞানী ও মূর্খ লোকের প্রভেদ।

জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত মূর্খ লোকের অনেক প্রভেদ। জ্ঞানী যেমন বহুগুণের আস্পদ, মূর্খও তেমনি বহু দোষের আস্পদ। জ্ঞানী শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করেন, মূর্খেরা কলহ, দ্বেষ, পরনিন্দা করিয়া লোকের মনে ক্লেশ দেয়। জ্ঞানী আপনার বিদ্যাবলে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজের ও আত্মীয় বন্ধুর অভাব দূর করেন। অন্যের উপকার করা দূরে থাকুক, মূর্খেরা আপনার উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না। জ্ঞানী গৃহে বসিয়া জ্ঞানচক্ষে পৃথিবীর ও আকাশের তত্ত্ব দেখিতে পাইতেছেন; মূর্খেরা আপনার চারি পার্শ্বের তত্ত্বও জানিতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানবলে সংসারের অহিত নিবারণ করিয়া হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, মূর্খের হিতাহিত বোধ নাই, মূর্খ ব্যক্তি পশুর সমান, সে অনেক সময়ে নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনে।

ধর্ম্মের মত উত্তম বন্ধু এ জগতে আর কেহই নাই। ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী

এক পুত্রও ভাল, বহু মূর্খ পুত্রও কোন কার্য্যের নহে। যেরূপ এক চন্দ্রের আলোকে গগনমণ্ডল আলোকিত হয়, কিন্তু সহস্র সহস্র তারকা অন্ধকার নাশ করিতে পারে না; সেইরূপ একমাত্র জ্ঞানী পুত্র দ্বারা কুল উজ্জ্বল হয়, কিন্তু বহু মূর্খ পুত্র হইতে কিছুই হয় না, বরং কুল কলঙ্কিত হয়। জ্ঞানী পুত্র ও গুণবতী কন্যা মাতাপিতার আনন্দ বর্দ্ধন করে, আর গুণহীন পুত্র ও গুণহীনা কন্যা মাতাপিতার কষ্টের কারণ হয়।

সত্যপ্রিয়তা।

সত্য উৎসাহ ও তেজের সঞ্চার করে; অসত্য ঘৃণা ও লজ্জা জন্মায়। সত্যবাদী বীরের ন্যায় কার্য্য করেন; কিন্তু মিথ্যাবাদীকে সর্ব্বদা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হয়। সত্যবাদীকে দেখিলেই তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মে; কিন্তু মিথ্যাবাদীরা তাঁহাকে দেখিয়া মহাতঙ্কে অভিভূত হয়।

সত্যের মাধুর্য্য আছে। ক্ষুদ্র শিশু যখন সরলভাবে সত্য কথা বলে, তখন যেন চারিদিকে মধুবৃষ্টি হয়। সুপ্রসিদ্ধ জর্জ্জ ওয়াশিংটন বাল্যকালে একদিন বালসুলভ স্বভাব বশতঃ তাঁহার পিতার একটি প্রিয় চেরীবৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা যখন তাঁহাকে ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, জর্জ্জ তুমিই কি এই বৃক্ষ কাটিয়াছ? বালক ওয়াশিংটন উত্তর করিলেন,—পিতা! আমি না জানিয়া বৃক্ষটিকে কাটিয়া ফেলিয়াছি আমায় ক্ষমা করুন। পুত্রের এই কথা শুনিয়া পিতার ক্রোধের শান্তি হইল। তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বারংবার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—বৎস! আমার শত শত চেরি বৃক্ষ অপেক্ষা তোমার কোমল অন্তরের একটি সত্যকথা লক্ষগুণে মূল্যবান।

অসত্য বলা নীচতা এবং ভীরুতার কার্য্য। অনেক সময় দেখা যায়, ভৃত্য প্রভুর ভয়ে মিথ্যা কথা বলে। এইরূপে ইহাদের মন ক্রমই নীচ ও ভীরু হইয়া যায়। সত্য বলিলে সময়ে সময়ে অপদস্থ হইতে হয় বটে, কিন্তু তথাপি মিথ্যা বলিয়া জিহ্বাকে কলঙ্কিত করা উচিত নহে। পৃথিবীর সম্মান ও গৌরব অপেক্ষা ঈশ্বরের সত্য সমধিক মূল্যবান।

সত্য মনুষ্য সমাজের ভিত্তি স্বরূপ। সকল মানুষই যদি অসত্য বলিত, তবে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না এবং তাহারা কখনও দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে পারিত না। মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি পরিবার ও প্রতিবেশীদিগের সহিত সুখে বাস করা অসম্ভব হইত। এই মহামূল্য সত্যের আদর করিতে সকলের প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বিনয়।

বিনয় মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূষণ। সকলের নিকট অবনত হওয়া বিনয়ীর স্বভাব। মলিনবসন পরিহিত হইলেও নম্রস্বভাব দরিদ্র ব্যক্তির কেননা আদর ও প্রশংসা করিয়া থাকেন? ধনশালী ব্যক্তি গর্ব্বিত ও উদ্ধত স্বভাব হইলে কেহ তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসে না। বিদ্বান ব্যক্তিও বিনয়ী না হইলে, তাঁহার বিদ্যার কোন মূল্য নাই; কারণ বিদ্যাই বিনয় দান করে। শান্ত, শিষ্ট ব্যক্তি সকলেরই বন্ধু। কেহ তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে পারে না। নম্র ব্যক্তি শত্রুকেও নিজের শিষ্ট ব্যবহারে বশীভূত করেন। উচ্চ কথা বলা কিংবা কাহাকেও অভদ্রোচিত গালি দেওয়া তাঁহার স্বভাব নয়। তাঁহার সরল ও সুমিষ্ট বাক্য কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে, এবং তিনি সকলের সমাদরের পাত্র হন। এইজন্যই পণ্ডিত ব্যক্তিরা জলের সহিত বিনয়ী ব্যক্তির তুলনা করিয়া থাকেন। জল যেমন নিম্নদিকে গমন করে, উচ্চদিকে গমন করে না; সেইরূপ বিনয়ী ব্যক্তি সতত অবনত

হইয়া চলেন, কাহাকেও উচ্চকথা বলেন না। জলে যেমন শরীর শীতল হয়, গাত্রের ক্লেদ দূর হয়; সেইরূপ বিনয়ীব্যক্তির কথা শুনিলে প্রাণ শীতল হয়, ও মনের মলিনতা দূর হইয়া যায়।

আলফ্রেড নামে ইংলণ্ডের একজন রাজা ছিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাকে একসময়ে এক কৃষকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। শান্ত ও নম্র স্বভাবগুণে তিনি কৃষক পরিবারের বিশেষ আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। একদিন কৃষকপত্নী চুল্লীর উপর হইতে যথাসময়ে একখানি রুটি নামাইবার জন্য আলফ্রেডকে আদেশ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। তিনি তখন মনে যুদ্ধ-বিষয়ক নানা আন্দোলন ও চিন্তা করিতেছিলেন, রুটির দিকে একবারও ফিরিয়া দেখিবার তাঁহার অবসর হয় নাই। কৃষকপত্নী আসিয়া দেখিল রুটী দগ্ধ হইতেছে। সে আলফ্রেডকে অতি কর্কশভাবে তিরস্কার করিতে লাগিল। আলফ্রেড দোষ স্বীকার করিয়া বিনিতভাবে ক্ষমা প্রর্থনা করি-লেন। এই ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার একজন সৈন্যাধ্যক্ষ তথায় আসিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে তভিবাদন করিল। কৃষক ও তাহার পত্নী তখন আলফ্রেডকে ইংলণ্ডের রাজা জানিতে পারিয়া, তাঁহার পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। মহানুভাব আলফ্রেড উভয়কে ভূমি হইতে উঠাইয়া বলিলেন, "দেখ, তোমরা আমার জীবনরক্ষা করিয়াছ, এইজন্যই তোমরা আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। আমার নিকট তোমাদের কোন অপরাধ হয় নাই।"

সর্ব্বাগ্রে বিনয় শিক্ষা করা উচিত। কাহারও কোন অন্যায় করিলে তজ্জন্য তাঁহার নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করাই প্রকৃত মনুষ্যের কার্য্য বাল্যকাল হইতেই মাতা পিতা ও গুরুজনের বাধ্য এবং বিনীতভাবে আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

পরোপকার।

পরোপকারী ব্যক্তি পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ। মনুষ্য হইতে জীব জন্তুর পর্য্যন্ত কোন না কোন উপকার করিতে পারিলে পরোপকারী ব্যক্তি আপনাকে ধন্য মনে করেন। পৃথিবীর সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে এবং সকল শাস্ত্রেই পরোপকারের ভূয়সী প্রসংসা দেখিতে পাওয়া যায়। পরোপকার সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোনপ্রকার মতভেদ দেখা যায় না। পরোপকার কার্য্যে জাতি, ধর্ম্ম কিংবা কুলশীলের বিচার নাই। নিম্ন ভূমিতে যেরূপ যেরূপ জল দ্রুতবেগে গমন করে, সেইরূপ দীন দুঃখী দেখিলেই পরোপকারীর দয়ার স্রোত প্রবাহিত হয়। কতশত কৃপাবান মহাত্মা দয়া পরতন্ত্র হইয়া, পরোপকার কার্য্যে ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্য দেখিলে বোধ হয়, পরের উপকার করিবার জন্যই যেন তাঁহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরোপকারী ব্যক্তি না থাকিলে, এই পৃথিবীতে কষ্টের সীমা থাকিত না। দুঃখীর দুঃখ মোচন, বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান; এই সকলই পরোপকারীর কার্য্য। পরোপকারী মনে করেন, যে অর্থ পরোপকারের জন্য ব্যয়িত হয়, সেই অর্থই সার্থক। দয়ালুগণ অতিথিশালা ও চিকিৎসালয় স্থাপন এবং পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি নানাপ্রকার সৎকার্য্য করিয়া, লোকের মঙ্গল সাধন করেন।

কি ধনী, কি দরিদ্র মনে করিলে সকল লোকই পরের উপকার করিতে পারেন। ধন থাকিলেই যে পরের উপকার করিতে পারা যায় তাহা নহে; শরীর, মন এবং কার্য্য দ্বারাও অপরের বিস্তর উপকার করা যায়। ফলতঃ যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপে উপকার করিতে পারেন।

লোকে বিদ্যাসাগরকে দয়ার সাগর বলিয়া থাকে। পরের কষ্টের কথা

শুনিলেই, তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইত। তিনি নানাপ্রকারে লোকের উপকার করিতেন। অর্থসাহায্য করিয়া, কতশত দরিদ্রের অনাথ বালক-দিগকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, কত দুঃখী গরিবকে অর্থদ্বারা প্রতিপালন করিয়াছেন, কত আশ্রয়হীন পতিত লোককে চিকিৎসাদি করাইয়া জীবন দান করিয়াছেন, তাঁহার ধন পরের উপকারের জন্যই ব্যয়িত হইত। জাতি কিংবা ধর্ম্ম বিচার করিয়া তিনি পরের উপকার করিতেন না। যথার্থ দয়ার পাত্র উপস্থিত হইলেই, তিনি তাহার উপকার করিতেন।

অধ্যবসায়।

কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া পুনঃ পুনঃ বাধা প্রাপ্ত হইলেও যাঁহারা আরব্ধ কার্য্য শেষ না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হন না, তাঁহারাই প্রকৃত অধ্যবসায়ী। সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই আপনার উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়। অবিরত চেষ্টা করিলে সহস্র বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া পরিণামে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। সুবিধা অন্বেষণ করিয়া অতি সহজ সহজ কর্ম্মে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিলে, ক্ষমতা সকলের পূর্ণ বিকাশ হয় না। তৎসমুদায় যতই কষ্টসাধ্য ও দুরূহ বিষয় সম্পাদনে নিযুক্ত হইবে; তাহাদিগের শক্তি ততই পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। যেমন সম্মুখস্থ অত্যুচ্চ শৈল উল্লঙ্ঘন করিয়া নদী সমধিক বেগবতীহয়, সেইরূপ ক্ষমতা সকল ও বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল, প্রভূত শক্তিরসম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসার প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় গুণ সকলের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত যত লোক অতি প্রয়োজনীয় নূতন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবনা ও নানাপ্রকার হিতকর বিষয়ের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম না করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। স্কটলণ্ড দেশীয় ফারগুসন্ সামান্য মেষপালকের

অবস্থায় স্বীয় যত্নে ও পরিশ্রমে জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ষ্টোন সামান্য মালির কার্য্য করিতে করিতে গণিত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব আন্তরিক চেষ্টাও যত্নথাকিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে উন্নত করিতে পারা যায়। এইরূপে অনেক বাধা সহ্য করিয়া অধ্যবসায় গুণে যাহা শিক্ষা করা যায়, তাহাতেই আপনার প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়।

অনেক আপনাদিগের ভ্রমে অতিশয় দুঃখিত ও শঙ্কিত হন। কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে নিরাশ হইয়া পড়েন। কিন্তু ভ্রম হইতে লোকের শিক্ষা পরিপক্ক হয়। যদি কোন কার্য্যের প্রথম উদ্যমেই কৃতকার্য্য না হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই একবিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহাতে তদ্বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান জন্মে। অধ্যবসায়ী কোন অভিষ্টসিদ্ধ করিবার জন্য যতক্ষণ চেষ্টা করেন, ততক্ষণ এক বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। ফলতঃ অধ্যবসায় দ্বারা মানবজীবনের যথার্থ উৎকর্ষ সাধিত হয়। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া নানা বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, ক্ষমতা সকল এরূপ কার্য্যকর হইয়া উঠে এবং ঈদৃশ দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় জন্মে, সে সহস্র বিঘ্ন হইলে ও অভীষ্টসিদ্ধির আশা ক্ষণমাত্রও মন হইতে তিরোহিত হয় না। রোমের প্রসিদ্ধ সেনাপতি এবং সম্রাট জুলিয়াস্ সীজরের বিজয়াশা এইরূপে এত বলবতী হইয়াছিল, যে একদা অর্ণবপোতে গমন করিতে করিতে ভয়ানক ঝড় দেখিয়া তাঁহার নাবিকেরা অতিশয় ভীত হইলে, তিনি তাহাদিগকে সদর্পে বলিয়া ছিলেন,—"ভয় নাই, এ তরি সীজরের সৌভাগ্য বহন করিতেছে।"

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর একজন দেশবিখ্যাত লোক। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুর দাস বন্দোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি নিজের গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেন। তাহার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে পড়িতে লাগিলেন, তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। কখনও তিনি বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না।

তিনি অতি কষ্টে ও অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া, লেখা পড়া শিখিতেন। দুই বেলা তাঁহাকে রাঁধিতে হইত। রাঁধিয়া পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে খাওয়াইয়া নিজে খাইতেন। রাত্রে রাঁধিতে রাঁধিতে যে সময় পাইতেন, তাহাতে পাঠ অভ্যাস করিতেন। সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ হইলে, তিনি এত পণ্ডিত হইয়াছিলেন যে, কলেজের অধ্যাপকেরা তাঁহাকে বিদ্যাসাগর উপাধি দেন।

১৮ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। ৫০৲ টাকা বেতনে শিক্ষকের কার্য্যে তিনি নিযুক্ত হন। কর্ম্মে তাঁহার এতদূর সুখ্যাতি হইয়াছিল যে, তাঁহার বেতন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অল্প কালের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদের বেতন ৫০০৲ টাকা।

বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার জন্মদাতা। পূর্ব্বে এই গদ্য রচনা-প্রণালী ছিল, তাহার ভাষা অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। বিদ্যাসাগর তাহার সংস্কার করিয়া নূতন বঙ্গভাষায় গঠন করেন। তিনি বঙ্গভাষায় অনেকগুলি

উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন এই পুস্তকগুলির আদর থাকিবে।

বাল্যকাল হইতেই তিনি পরের দুঃখ দেখিলে কাতর হইতেন, ও তাহাদিগকে সাহায্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় তিনি যে বৃত্তি পাইতেন, তাহা তাঁহার পিতার নিকট দিতেন। নিজের কষ্ট সত্বেও, কোন কোন সময়ে, বৃত্তির টাকা হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া, দরিদ্র সমপাঠিদিগকে সাহায্য করিতেন। নিজের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিলনা। নিজের হয়ত সামান্য একখানি মোটাধুতি ব্যতীত দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, তথাপি পরকে সাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদা ব্যগ্র ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের ন্যায় মাতাপিতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বলিতেন, "জনক জননী—প্রত্যক্ষ বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা।" তিনি মাতাপিতার প্রতিকৃতি প্রস্তুত করাইয়া বাসগৃহে রাখিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতেন ও উদ্দেশে প্রণাম করিয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার ন্যায় করুণার সাগর, স্নেহের উৎস, ভক্তির অবতার, নিরন্নের অন্নদাতা, বিপন্নের উদ্ধারকর্ত্তা, ও দীনহীন কাঙ্গালের প্রতিপালক সংসারে দুর্লভ। ১২৯৮ সাল, ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, রাত্রি দুই ঘটিকার সময় ইনি পরলোক গমন করেন।

রামদুলাল দে।

রাম দুলাল অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি মাতৃপিতৃহীন হন। ইহাঁর মাতামহ হাটখোলার দত্তবাটীতে মুহুরীর কর্ম্ম করিতেন। রামদুলাল সেখানেই থাকিতেন। এইখানে তিনি

যৎসামান্য ইংরাজী শিক্ষা করেন। তৎপর ৫৲ টাকা বেতনে দত্তদিগের বিল সরকার হন। কিছুদিন পরে তাঁহার ১০৲ টাকা বেতন হয়। এই সময়ে ইনি প্রচুর দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য নিলামে যাতায়াত করিতেন। একদিন ১৪ হাজার টাকা দিয়া একখানি জলমগ্ন জাহাজ ক্রয় করেন। তিনি নিলাম গৃহের বাহিরে আসিলে, একজন সাহেব প্রায় লক্ষ টাকা দিয়া সেই জাহাজ ক্রয় করিলেন। রামদুলাল সমস্ত টাকা প্রভুকে আনিয়া দিলেন। তিনি রামদুলালের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া সেই সমস্ত টাকা তাঁহাকে দিলেন। এইখান হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল। এই টাকা লইয়া তিনি নানা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এবং অল্পদিনের মধ্যে অতুল সম্পত্তির অধিপতি হইলেন। কেবল যে তিনি ধন উপার্জ্জন করিতেন এমন নহে, তাঁহার ন্যায় দাতাও সংসারে অতি বিরল। প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তিনি কাশীতে মন্দিরাদি সংস্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত আরও নানাবিধ দানে তিনি প্রায় ৪।৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

রাম দুলাল অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। যখন তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, তখনও তিনি দত্তবাটীর মাসিক বেতন দশ টাকা স্বয়ং আনিতে যাইতেন, এবং মদনমোহন দত্তের নিকটে যাইবার সময় পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া, করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন। অহঙ্কার রামদুলালের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই; ধনমদে তাঁহাকে গর্ব্বিত করিতে পারে নাই। দয়াই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম ছিল। আশ্রিত বাৎসল্য তাঁহার স্বভাবকে মধুময় করিয়াছিল। প্রতিদিন তাঁহার বাটীতে পাঁচশত লোক অন্ন পাইত। রামদুলাল আপনার বেলগাছিয়া বাগানে একটী অতিথিশালা স্থাপন করেন। তথায় হিন্দু মুসলমান সকলেই ইচ্ছামত আহার পাইত। তাঁহার মনে কিছুমাত্র ধর্ম্মবিদ্বেষ ছিল না।

সত্যবাদিতা তাঁহার একটী প্রধান গুণ ছিল। তিনি মিথ্যা কথাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন ও শপথ করিতে ভীত হইতেন। কেহ কোন মোকর্দ্দমায় তাঁহাকে সাক্ষী মানিলে, শপথের ভয়ে, তিনি নিজের টাকা দিয়া মোকর্দ্দমা মিটাইয়া দিতেন। পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীদিগের প্রতিও রামদুলাল সদয় ব্যবহার করিতেন। বৃথা আমোদ প্রমোদ তাঁহার চির বিদ্বেষ ছিল। এরূপ মহাপুরুষের জীবন সকলের আদর্শ।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ভবানীপুর গ্রামে হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম রামধন মুখোপাধ্যায়। ইহারা দুই সহোদর ছিলেন, তন্মধ্যে হরিশ্চন্দ্র কনিষ্ঠ। সপ্তমবর্ষ বয়সে হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। দুরবস্থা বশতঃ হরিশ বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ছাত্ররূপে গৃহীত হন। শিক্ষকেরা হরিশ্চন্দ্রের পাঠে আগ্রহ ও অভিনিবেশ, এবং অসাধারণ বুদ্ধি দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, কালে ইনি একজন বিদ্বান লোক হইবেন। হরিশকে অল্প বয়সেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কর্ম্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

হরিশ্চন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ও কার্য্য দক্ষতায় ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ লাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিতি মাসিক চারিশত টাকা বেতনে এসিটাণ্ট অডিটর পদ প্রাপ্ত হন। বিদ্যালয় ত্যাগের পর তাঁহার অধ্যয়ন স্পৃহা ও শিক্ষানুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি প্রতিদিন নিয়মিত কার্য্য শেষ হইলে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকালয় মেট-কাফ্ হলে যাইয়া ইচ্ছানুরূপ বহুবিধ পুস্তক পাঠ করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ইংরাজী লেখার অভ্যাস ছিল। তৎকালে প্রচলিত প্রায় সমুদয় ইংরাজী সংবাদ পত্রেই তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন।

বিখ্যাত হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকা তিনি অতি দক্ষতার সহিত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে এদেশে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সাহেবেরা সকলেই বঙ্গদেশে কোর্টমার্সেল আইন বিধান করিবার জন্য বড়লাট বাহাদুর লর্ড ক্যানিংকে অনুরোধ করেন। কিন্তু নির্ভীক, স্বদেশহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে সদাশয় বড়লাট উক্ত আইন বিধিবদ্ধ করেন নাই।

দরিদ্রের দুঃখ দেখিলে হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি আইন শিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু ওকালতী করেন নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, ওকালতী করিলে, লোকের উপকার করিবার সময় পাইব না। আমি বড় মানুষ নহি যে, অর্থ দিয়া কাহার উপকার করিতে পারিব, তবে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা যদি কাহারও কিছু উপকার করিতে পারি, সে সুযোগ কেন ত্যাগ করিব। তিনি প্রজাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নীলকর সাহেবদিগের কার্য্যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সাধারণের হিতকার্য্যে অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া, তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িল। ১২৬৮ সালের ১২ই আষাঢ় ৩৮ বৎসর বয়সে অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্র প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। জগতে কত লোক জন্মগ্রহণ করিতেছেন কতলোক মৃত্যুমুখে পড়িতেছেন; কিন্তু যিনি সাধারণের হিত কামনায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তিনিই ধন্য! তাঁহারই জন্ম সার্থক।

রাণী ভবানী।

রাজসাহী জেলায় নাটোর নামে এক বিখ্যাত স্থান আছে। এই স্থানে পূর্ব্বে রাজা রামকান্ত নামে একজন বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম রাণী ভবানী। রাণী ভবানীর পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতিয়া গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। ভবানী অতিশয় গুণবতী ও পরমাসুন্দরী ছিলেন বলিয়া রাজা রামকান্ত তাঁহাকে বিবাহ করেন।

রাজা রামকান্ত জমিদারী কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। এ জন্য তাঁহার জমিদারী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এই সময়ে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বঙ্গ দেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। তিনি রামকান্তকে অযোগ্য দেখিয়া অপর এক ব্যক্তির হস্তে জমিদারী অর্পণ করেন। কিন্তু পরে রাণী ভবানী স্বয়ং নবাবের নিকট আবেদন করিয়া জমিদারী পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই রাজা রামকান্তের মৃত্যু হয়। অতঃপর বিধবারাণী ভবানী জমিদারী স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল, এবং তিনি জমিদারী কার্য্য অতিশয় দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন।

রাণী ভবানীর কোন পুত্র ছিল না। একমাত্র কন্যা তারাসুন্দরী তিনিও বাল্যকালে বিধবা হইয়াছিলেন। অবশেষে রাণী এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এই পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ। ইনি পরম ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোক ছিলেন। রাণী ভবানী এই দত্তক পুত্রের হস্তে বিষয়ের ভার ন্যস্ত করিয়া, বিধবাকন্যা সহ গঙ্গাতীরে বড়নগর নামক স্থানে বাস করেন। বড়নগরে রাণী ভবানী স্বীয় বাসযোগ্য এক বাটী ও একটী দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এবং যতদিন জীবিতাছিলেন, ততদিন এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। ধর্ম্মকর্ম্ম ও পরোপকারই তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল। দেবসেবা, দুঃখীর দুঃখ মোচন, জলাশয় খনন প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্ম করিয়াই তনি জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার নাম আমাদের দেশে চির স্মরণীয় হইয়াছে।

রাণী ভবানী জীবিতা থাকিতেই রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। অতঃপর

তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ রাজা হইয়াছিলেন। রাজা বিশ্বনাথের বংশাবলী অদ্যাপি নাটোরে বর্ত্তমান আছেন; এবং তাঁহারা নাটোরের মহারাজ নামে বিখ্যাত হইয়া থাকেন।

সার সৈয়দ আহম্মদ।

সৈয়দ আহমদ খাঁ ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'সার' এই সম্মানসূচক উপাধি দান করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে আহমদখাঁ দিল্লীর এক উচ্চ মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা সৈয়দ মোহাম্মদ তকি খাঁ একজন পরম সদাশয় ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। দিল্লীর বাদসাহের দরবারে তাঁহার অশেষ খ্যাতি ও সম্মান ছিল।

সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাল্যকাল হইতে পরম সত্যবাদী ছিলেন। সত্য কথা বলিতে তিনি কখনও কাহাকেও ভয় করিতেন না। বাল্যকালে তিনি বাদসাহের দরবারেই কাটাইয়াছিলেন। এক দিবস প্রাতে দরবারে আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল, বাদসাহ তাঁহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বালক সৈয়দ আহম্মদ নির্ভীকচিত্তে বলিলেন, 'আমার ঘুম ভাঙ্গে নাই'। বাদসাহ সৈয়দ আহমদের সরল সত্যবাদিতায় পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

সৈয়দ আহমদ আরবী ও পারসী ভাষায় বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইলে, তিনি মুনসেফের পদ প্রাপ্ত হন এবং অবশেষে সবজজ হইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নানা উপাধি, বৃত্তি, প্রভৃতি দান করিয়া সম্মানিত করেন।

সার সৈয়দের চরিত্র অতিশয় উদার ও মহৎ ছিল। পরের উপকারের নিমিত্ত তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মুসলমান গণের

মধ্যে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, তাহার জন্য তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই যত্নে আলিগড় নামক স্থানে এক সুবৃহৎ কলেজ স্থাপিত হয়। এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সার সৈয়দ আহম্মদ ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন এবং ভারতবাসী মুসলমানগণ চিরদিনের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ৮১ বৎসর বয়সে সার সৈয়দ আহম্মদ পরলোক গমন করেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

ভিক্টোরিয়ার পিতা ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজা তৃতীয় জর্জ্জের পুত্র। তিনি জার্ম্মানী দেশের রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া মেরী লুইসাকে বিবাহ করেন। ইংলণ্ডের কেনসিংটন রাজগৃহে ভিক্টোরিয়ার জন্ম হয়। বাল্যকালেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতা অতি যত্নে কন্যাকে সুশিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই সত্যের প্রতি তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। একদিন পড়িবার সময় তিনি শিক্ষয়িত্রীর নিকট কয়েকবার অবাধ্য হইয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়ার মাতা তাহা জানিতে পারিয়া শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, একবার মাত্র অবাধ্য হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া ভিক্টোরিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মা' আমি দুইবার অবাধ্য হইয়াছিলাম।

আঠার বৎসর বয়সে তিনি ইংলণ্ডের মহারাণী হন। ইহার কিছুদিন পরে সেক্সকোবার্গের রাজকুমারের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার এরূপ মাতৃভক্তি ছিল যে মাতার পীড়া হইলে, তিনি তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া দিবারাত্র শুশ্রূষা করিতেন এবং মাতার মৃত্যু হইলে পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকার ন্যায় 'মা' 'মা' বলিয়া সর্ব্বদা রোদন করিতেন।

মহারাণী অত্যন্ত দয়াবতী ছিলেন। পরের দুঃখের কথা শুনিতে পাইলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা মোচন করিতেন। এক সময়ে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কোন হাঁসপাতালে একটী পীড়িতা বালিকা তাঁহাকে দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। তাহার বিশ্বাস তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, তাহার পীড়া আরোগ্য হইবে। এইকথা শুনিয়া দয়াবতী মহারাণী স্বয়ং সেই হাঁসপাতালে বালিকাটীকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

সামান্য জিনিষটী পর্য্যন্ত মহারাণী যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতেন। তাঁহার নিকট নানা স্থান হইতে নানা প্রকার উপহার আসিত। ঐ সকল উপহার সুন্দর সুন্দর ফিতা ও সূতা দ্বারা বাঁধা থাকিত। মহারাণী ঐ সকল ফিতা ও সূতা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতেন। ঐ সকল সূতা ও ফিতার মূল্য ১১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা হইয়াছিল।

খৃষ্ট ধর্ম্মের উপর তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। এক সময়ে অফ্রিকার একজন রাজা মহারণীর নিকট উপহার পাঠান এবং দূতকে মহারাণীকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিলেন তাঁহার এরূপ উন্নতির কারণ কি? তিনি দূতকে একখানি বাইবেল দিয়া বলিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার উন্নতির প্রধান কারণ।

৮২ বৎসর বয়সে মহারাণীর মৃত্যু হয়। তিনি ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী ছিলেন। তাঁহার সময়ে ইংলণ্ডের নানাবিধ উন্নতি হয়। তাঁহার ন্যায় কোন রাজা বা রাণী প্রজাদিগের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর সকলে মনে করিয়াছিল, যেন সত্যসত্যই সকলে মাতৃহারা হইল। তাঁহার রাজ্যের প্রজাগণ তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিল।

পরিশিষ্ট।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি লেখ :—

(১) বানর।

বানর জাতির শ্রেণী, বানর জাতি সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা, মর্কট, কপি, এবং হনুমান।—মানবের সহিত সাদৃশ্য, বানর সাদৃশ্যে কতক অংশ মানবের মত। বানরের বাসস্থান, ভারতবর্ষ, এবং মালয়দ্বীপপুঞ্জে, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশে, ইহারা বাস করিয়া থাকে। বানরের বংশ বিশাল।—বানরের খাদ্য,—বানরগণ সাধারণতঃ ফলমূল, শাক, শবজি, ইক্ষুরস এবং সময় সময় কীট পতঙ্গাদিও ভক্ষণ করিয়া থাকে। বানরের প্রকৃতি অনেকটা মানুষের মত। বানরের অদ্ভুত বুদ্ধি, বানর বড়ই কৌতুক প্রিয়, ইহারা কৌতুক করিবার নিমিত্ত নিরীহ প্রাণীদিগকে যন্ত্রণা প্রদান করিতে বড় ভালবাসে। বানরের শক্তি ও গতি, ইহাদের শক্তি অপরিমিত, ইহারা মানুষের মত দুই পায়ে কিংবা অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুগণের মত চারি পায়ে ভরদিয়া মৃদুগতিতে ভ্রমণ করে না। ইহারা কেবল লাফাইয়া বেড়ায়। বানরের শিক্ষা, ইহাদিগকে যাহা শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই শিক্ষা করে। বানরের সমাজ প্রিয়তা, বানর জাতি মানুষের মত সমাজ প্রিয়, ইহারা একাকী থাকিতে ভাল বাসে না। বানরের উপকার ও অপকার, বানর মানুষের কোন উপকার করে না বরং নানাপ্রকার অপকার করে। বানরের ক্রোধ, বানরের ক্রোধ অতিশয় ভয়ানক সময় সময় ইহাদের মধ্যে এরূপ বিবাদ উপস্থিত হয় যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া একজনের নিপাত না হইলে তাহা হইতে ক্ষান্ত হয় না।

(২) গরিলা।

গরিলার আকৃতি—গরিলা বানর জাতীয় একপ্রকার চতুর্ব্বাহু জন্তু সাধারণতঃ তদপেক্ষা ভয়ানক ও পরাক্রমশালী। মানুষের সহিত সাদৃশ্য গরিলার দেহাকৃতি কতকাংশে মানুষের মত, গরিলা মানুষ নহে তাহারা প্রমাণ, একটি লোক একটি স্ত্রী গরিলাকে বধ করিয়াছিলেন এবং তাহার চর্ম্মও শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছিল। প্রাণীতত্ত্ব পণ্ডিতগণ ইহার চর্ম্ম দেখিয়াই স্থির করিলেন ইহা কখন—মনুষ্য নহে। গরিলা কোথায় বাস করে এবং কি আহার করে—আফ্রিকার নিবীড় বনে জনশূন্য গিরি-গহ্বরে বাস করে এবং ফল মুল, কোমল পত্র প্রভৃতি খাইয়া থাকে।

(৩) বনমানুষ।

বনমানুষের আকৃতি—বনমানুষের আলয় খাদ্য ও বাসস্থান—ইহার শক্তি, বুদ্ধি প্রভৃতি।

(৪) চিতাবাঘ।

চিতাবাঘের আকার—পেনথারের আকার, আউন্সের আকার ইহারা কোথায় বাসকরে। ইহাদের প্রকৃতি—চিতাবাঘ ধরিবার কৌশল।

(৫) তরক্ষু।

তরক্ষুর আকৃতি ও গতি—ইহার বাসস্থান—ইহার খাদ্য ও শীকার প্রণালী ইহার প্রকৃতি, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি।

(৬) শৃগাল।

শৃগালের আকৃতি ও স্বর—ইহাদের বাসস্থান ও আহার—শৃগালের লোমের হ্রাস বৃদ্ধি—শৃগালের সমাজপ্রিয়তা—কুকুরের সহিত শক্রতা—শৃগালের নরমাংসপ্রিয়তা।

(৭) নকুল।

নকুলের আকার ও বাসস্থান—নকুলের শীকারপ্রণালী—ইহার উপকার ও অপকার, নকুলের বশ্যতা।

(৮) খট্বাশ।

খট্বাশের আকার ও বাসস্থান—ইহার শীকারপ্রণালী ও শক্তি।

(৯) সীল।

সীলের আকার, কর্ণ ও নাসিকার অদ্ভুত গঠন—সীলের পদদ্বয়ের গঠন—ইহাদিগের আকার ও আহার প্রভৃতি—ইহাদিগের বাসস্থান পরিত্যাগ প্রণালী।

(১০) উদ্বিড়াল।

উদ্বিড়ালের আকার—ইহাদিগকে পোষ মানাইবার উপায়।

(১১) মৃগনাভি ইন্দুর।

মৃগনাভি ইন্দুরের আকার—ইহাদিগের গতি—ইহাদিগের বাসস্থান—ইহাদিগের খাদ্য।

(১২) কেঙ্গেরু।

কেঙ্গেরুর আকৃতি—ইহাদিগের আত্মরক্ষণপ্রণালী—ইহাদিগের খাদ্য ও সমাজপ্রিয়তা প্রভৃতি—কেঙ্গেরুর আকার।

(১৩) উষ্ট্র।

বেক্ট্রিয়ান উষ্ট্র ও ড্রমেডারি—উষ্ট্রের উচ্চতা ও গতি—উষ্ট্রের প্রাচীনত্ব এবং হস্তীর সহিত বিশেষ পার্থক্য—উষ্ট্রের পাকস্থলী—উষ্ট্রের কুব্জ বা ভাণ্ডার গৃহ। উষ্ট্রের উপকার—উষ্ট্রের শক্তি খাদ্য প্রভৃতি—উষ্ট্রের দুগ্ধ—উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ প্রণালী।

(১৪) শূকর।

শূকরের দন্ত—ইহাদের সমাজপ্রিয়তা প্রভৃতি—শূকরের আত্মরক্ষা প্রণালী—ভারতবর্ষের শূকর।

(১৫) বীবর।

বীবরের আকার—ইহাদের সমাজপ্রিয়তা ও শিল্পনৈপুণ্য—বীবরের একতা—ইহাদিগের আনুগত্য—বীবরের পল্লী।

(১৬) কাঠ বিড়াল।

কাঠ বিড়ালের আকার ও দন্ত—ইহাদিগের খাদ্য এবং বাসস্থান।

(১৭) খরগোস।

খরগোসের আকৃতি—ইহাদিগের খাদ্য এবং বাসস্থান—ইহাদের সন্তান বাৎসল্য। ইহাদের দর্শন ও শ্রবণ শক্তি।

(১৮) শশক।

শশকের আকার ও বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি—ইহাদের গতি—ইহাদের বাসস্থান—ইহাদের খাদ্য।

(১৯) বাদুড়।

বাদুড়ের দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণ শক্তি—বাদুড়ের খাদ্য এবং বাসস্থান—ইহাদিগের অপকার।

(২০) তিমি।

তিমির আকার ও শ্রেণীবিভাগ—তিমি ও মৎস্যে পার্থক্য—তিমির পুচ্ছ—ইহাদিগের খাদ্য—তিমির অপত্যস্নেহ—তিমির মৃগয়া প্রণালী।